সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রসার

ISSN 2582-5674
RNI : WBBEN/2003/11192

বর্ষ -২২ সংখ্যা-১
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মূল্য : ২০ টাকা

# বিজ্ঞান অন্বেষক

www.bigyananneswak.org.in
whts : 7980121478/9143264159

আলফ্রেড নোবেল

নোবেল রসায়ন

ডেভিড বেকার

জাম্পার

হাসাবিস

নোবেল চিকিৎসা বিজ্ঞান

রুভকুন

অ্যামব্রোজ

নোবেল পদার্থ বিজ্ঞান

হিন্টন

হপফিল্ড

লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার (LHC)

নীল তিমি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

## এই সংখ্যায়

❑ নোবেল ২০২৪ (চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ, শান্তি ও অর্থনীতি) ❑ বিপন্ন নীল তিমি ❑ বিবর্তনের পেনসিল ❑ গায়া BH ৩ ❑ শিক্ষক শিখনে সার্ন ❑ অঙ্ক (সীমানা ছাড়িয়ে) ❑ স্মরণ : আশীষ মুখার্জী ও রেখা দাঁ ❑ কত অজানারে জানাইলে তুমি ❑ সাগরতলের অনুসন্ধান ❑ মহানন্দা নদী ❑ সালফারের চাঁদ ❑ আলোক দিবস ২০২৪ ❑ প্রবন্ধ : জগদীশচন্দ্র বসু ❑ ছবি অঙ্কন ❑ যারা হারিয়ে যাচ্ছে ❑ বিজ্ঞানের সংবাদ

পল্লব রায়গুপ্ত

# বিজ্ঞানের খবর

## শূন্য মানে কি?

মানব ইতিহাসে শূন্যের আবিষ্কার এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের মাথা শূন্যকে কিভাবে বোঝে সেই বিষয়টি এক সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠে এসেছে। মস্তিষ্ক শূন্যকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে বোঝে। এটি কীভাবে দেখানো হয় তার উপর নির্ভর করে। যদি শূন্যকে সংখ্যা ০ হিসেবে দেখানো হয়, এটি অন্যান্য ছোট সংখ্যার সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু যদি শূন্যকে ফাঁকা জায়গা বা শূন্যস্থান হিসাবে দেখানো হয়, মস্তিষ্ক এটিকে আলাদা কিছু মনে করে। এই কারণেই মানুষ প্রায়ই শূন্যকে চিনতে বা একের মতো ছোট সংখ্যার থেকে আলাদা করতে সমস্যায় পড়ে। জার্মান গবেষক আন্দ্রিয়াস নিডার ও তাঁর সঙ্গী গবেষকদল মিলে দেখেছেন, মানুষ এবং অনেক প্রাণী শূন্য এবং কাছাকাছি সংখ্যাগুলোর মধ্যে প্রায়ই গুলিয়ে ফেলে। কাক এবং বানরের উপর পরীক্ষা করেও একই জিনিস দেখা গেছে।

## গণিতবিদ ব্যাকটেরিয়া

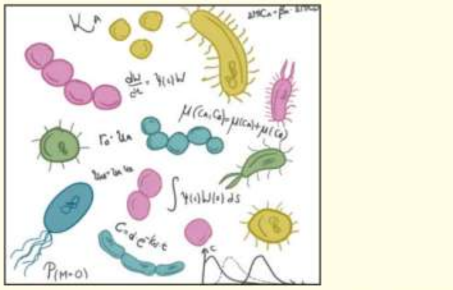

শুনতে কল্পবিজ্ঞানের গল্প মনে হতে পারে। সাহা ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বিজ্ঞানী সংগ্রাম বাগের তত্ত্বাবধানে গবেষকরা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে কিছু ব্যাকটেরিয়া তৈরি করেছেন যারা অঙ্ক কষতে পারবে। তাঁরা ব্যাকটেরিয়া কোষগুলো নিয়ে একটি মডুলার মাল্টিসেলুলার সিস্টেম তৈরি করেছেন। এই সিস্টেমটি এমন ভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে যে তারা সিদ্ধান্তমূলক গণনার সমস্যা সমাধান করতে পারবে। তারা নাম দিয়েছেন 'ব্যাক্টোনিউরন'। এরা যোগ এবং বিয়োগ করতে পারে। এছাড়াও এই সিস্টেমটি ০ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা মৌলিক (প্রাইম) কিনা তা চিনতে পারে এবং A থেকে I-এর মধ্যে কোনও অক্ষর স্বরবর্ণ কিনা তা নির্ধারণ করতে পারে। আরও একটি সিস্টেম তারা তৈরি করেছে, যা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সরলরেখা দিয়ে সর্বাধিক পাইয়ের অংশ কাটা সম্ভব কিনা তা গণনা করতে পারে। এই গবেষণা বায়োকম্পিউটার প্রযুক্তি এবং বহু-কোষীয় সিন্থেটিক জীববিদ্যার ক্ষেত্রে বড় উন্নয়নের সম্ভাবনা দেখাচ্ছে।

## মহাকর্ষ কি কোয়ান্টাম?

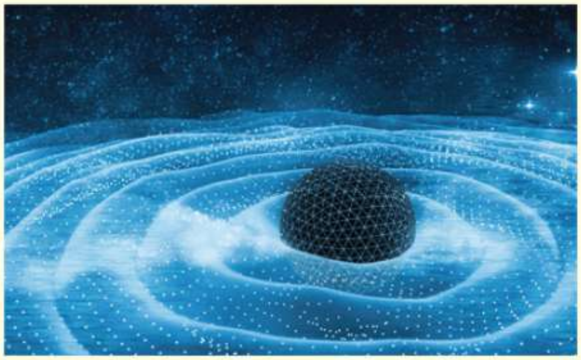

বিজ্ঞানীদের স্বপ্নের থিওরি অফ এভরিথিং খুঁজে পাওয়ায় একমাত্র বাধা মহাকর্ষ বল। প্রকৃতির সব কান্ডকারখানার পিছনেই রয়েছে চারটে বল (force)। মহাকর্ষ বা গ্র্যাভিটেশনাল তড়িৎচৌম্বকীয় বা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক, স্ট্রং ফোর্স এবং উইক ফোর্স। এদের মধ্যে মহাকর্ষ ছাড়া সবাইকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। সম্প্রতি একদল বিজ্ঞানী একটি নতুন পরীক্ষা প্রস্তাব করেছেন যা জানতে সাহায্য করবে মহাকর্ষ, চতুর্থ শক্তি, কোয়ান্টাম প্রকৃতির কিনা। এই প্রস্তাবের পিছনে রয়েছেন বেশ কয়েকজন বাঙালি বিজ্ঞানী। যার মধ্যে কলকাতার বোস ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানী দীপঙ্কর হোম অন্যতম। কোয়ান্টাম দুনিয়ায় শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের সাহায্যেই কোন পরীক্ষার ফলাফল বদলে ফেলা যায়। কিন্তু সাধারণ বা ক্লাসিক্যাল জগতে এমন হয় না।

## মহাকাশে সার্কিট তৈরি সম্ভব

আমেরিকার লোওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা জৈবিক পলিমার ব্যবহার করে এক ধরনের কালি বানিয়েছেন যা বিদ্যুৎ পরিবহন করতে সক্ষম। এই কালি রূপালি ন্যানোপার্টিকেল দিয়ে তৈরি। তাপমাত্রা বাড়িয়ে এই কালি মুদ্রণ করে বৈদ্যুতিক সার্কিট তৈরি করা হয়। এই কালির বিশেষত্ব হল এটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ব্যবহার করে তৈরি হয় এবং মাধ্যাকর্ষণ ছাড়াই কালি জমা করতে সাহায্য করতে পারে। যদি এই প্রযুক্তি শূন্য মাধ্যাকর্ষণে কাজ করে, তাহলে মহাকাশচারীরা মহাকাশযানের বৈদ্যুতিক সার্কিট তৈরি বা যন্ত্র মেরামতের জন্য এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। তাছাড়া মহাকাশের বিশেষ শূন্য-মাধ্যাকর্ষণ পরিবেশে উচ্চমূল্যের ইলেকট্রনিক উপাদান উৎপাদন করাও সম্ভব হতে পারে।

**লেখক বিজ্ঞান লেখক, আই.আই.টি., মাদ্রাজ** ❑ *email : pallab.roygupta@shaastramag.iitm.ac.in.* । *M. 9681021007*

# বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক

প্রবীর বসু

সম্পাদকমণ্ডলী

জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সরদার, চন্দনসুরভি দাস, দীপাঞ্জন দে, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, তুষার কান্তি নাথ, শতাব্দী দাশ, সোমা বসু, অর্চন সমাজদার, উজ্জ্বল কান্তি রায়, রিঙ্কু দাস, মোহা: গোলাম হামজা (রাহুল), কিঞ্জল বিশ্বাস

উপদেষ্টামণ্ডলী

শঙ্করকুমার নাথ, দীপককুমার দাঁ, সিদ্ধার্থ নারায়ণ জোয়ারদার, বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, প্রকাশ দাস বিশ্বাস, রাজা রাউত, তপন দাস, মানসপ্রতিম দাস, সুমিত্রা চৌধুরী, জয়শ্রী দত্ত, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, তপন সাহা, সৌমেন বিশ্বাস, সমীর নাগ



: website :
www.bigyananneswak.org.in/
ssu2011.com/bigyananneswak

e-mail :
bigyanannesak1993@gmail.com.

Mobile & Whatsapp No.
9830676330 / 9143264159/7980121478



প্রচ্ছদ বিন্যাস ও পরিকল্পনা

টিম বিজ্ঞান অন্বেষক


## সুভাষিতম

জন্ম : ০১.০১.১৮৭৪ মৃত্যু : ০৪.০২.১৯৭৪

"যারা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা হয় না,
তারা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।"

*বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু*

## বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার ২২ বছর

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা ২১ বছর পেরিয়ে ২২ বছরে পদার্পণ করল। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সংখ্যায় নোবেল পুরস্কার নিয়ে ৫টি লেখা চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, শান্তি ও অর্থনীতি বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

সার্ন (CERN-*European Organization for Nuclear Research*)-এর শিক্ষক প্রশিক্ষণ রিপোর্ট এই সংখ্যায় আছে। সার্ন হল বিশ্বের বৃহত্তম কণাপদার্থবিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র, যা সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সের সীমান্তে অবস্থিত। এটি ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মূলত উচ্চশক্তির কণাপদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য পরিচিত। এর বিখ্যাত প্রকল্প হল লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার (LHC), যা বিশ্বে বৃহত্তম শক্তিশালী কণা ত্বরক।

এছাড়া এবারের সংখ্যায় বিবর্তনের পেঙ্গিল, গুগুল নিয়ে একটি বর্তমান সময়ের লেখা, অংক নিয়ে (সীমানা ছাড়িয়ে), বিজ্ঞানকর্মী ও লেখক রেখা দাঁ এবং আকাশপ্রেমী ও বিজ্ঞান প্রচারক আশীষ মুখার্জী- এদের স্মরণে দুটি লেখা, সমুদ্রে প্লাস্টিক দূষণে নীল তিমি বিপন্ন, মহানন্দা নদীর দূষণ, সালফারের চাঁদ, সাগরতলের সন্ধানে, কৃষ্ণগহ্বর, আন্তর্জাতিক আলোক দিবস-২০২৪, জগদীশচন্দ্র বসুর জীবন ও কর্ম নিয়ে এক ছাত্রীর লেখা, ছাত্রীদের ছবি অঙ্কন, যারা হারিয়ে যাচ্ছে, বিজ্ঞানের সংবাদ সহ বিভিন্ন লেখা রয়েছে।

আমরা মনে করি পত্রিকাটি আপনার নিজের। পত্রিকা নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করুন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার লেখা পত্রিকায় প্রকাশ করতে চাই। আরও একটি বিষয়, পত্রিকার জন্য বিশেষ তহবিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সকলের কাছে সাহায্যের আবেদন রাখছি।

গত কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশনার পক্ষ থেকে বেশ কিছু বই (ISBN সহ) প্রকাশিত হচ্ছে। আশার কথা পাঠকমহলে এই বইগুলির বেশ ভালো চাহিদা। ইতিমধ্যে 'রসনার রসায়ন' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

*বাঁদিকে রিঙ্কু দাস*

*ডানদিকে অনিন্দ্য দে*

সার্ন আয়োজিত International Teacher Week-2024 সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে এ বছর রিঙ্কু দাস ও অনিন্দ্য দে অংশগ্রহণ করেন। পত্রিকার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।


ISSN 2582-5674

9 772582 567004

*বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।*

*অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯*

*যোগাযোগ : ৭৯৮০১২১৪৭৮/৯২৩১৫৪৫১৯১/৯৪৩২৩৩৫৮৮২/৮৯৪৪৯৬৭৫৫/৭০০১৩৩৭৭১৪/৮২৪০২৪৪৩২৩*

# সূচি


১ সুভাষিতম

বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার ২২ বছর

৩ প্রচ্ছদ কথা ১

নোবেল : চিকিৎসা বিজ্ঞান

ড. তুষারকান্তি নাথ

ক্ষুদ্র আর.এন.এ. বৃহৎ আবিষ্কার

৫ প্রচ্ছদ কথা ২

নোবেল : রসায়ন

ড. তপন দাস

এসো প্রোটিনের নকশা খুঁজি

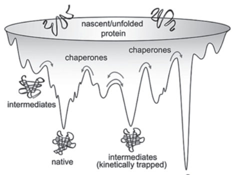


৮ প্রচ্ছদকথা ৩

নোবেল : পদার্থবিদ্যা

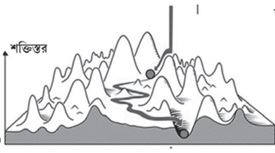


অনিন্দ্য দে

তথ্যের ভিড়ে নকশার খোঁজে

১১ প্রচ্ছদকথা ৪

নোবেল : শান্তি

ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

পারমাণবিক অস্ত্রবিরোধী আন্দোলন ও আমরা

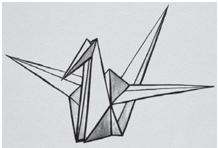

১২ প্রচ্ছদ কথা ৫

নোবেল : অর্থনীতি

অর্কজিৎ সেন

অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার

১৩ প রি বে শ

মাইক্রোপ্লাস্টিকের বিপন্ন নীল তিমি

রাহুল রায়

১৬ বিবর্তনের পেনসিল

রাজর্ষি ঘোষ

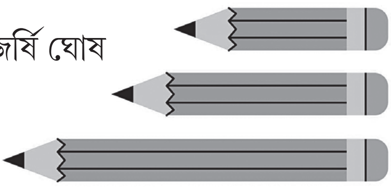

১৭ মহাকাশ : গায়া- BH-৩

ড. শামীম হক মণ্ডল

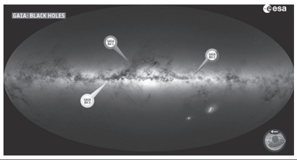

১৮ সার্ন রিপোর্ট

শিক্ষক শিখনে সার্ন

শ্রীমতি রিঙ্কু দাস

১৯ অংক

সীমানা ছাড়িয়ে...

অঙ্কিতা সেনগুপ্ত

২০ স্মরণ

আশীষ মুখার্জী

ডা. সুকান্ত মুখার্জী

২১ প্রচ্ছদ কথা ৬

কত অজানারে জানাইলে তুমি

মালবিকা দে

২৪ অনুসন্ধান

সাগরতলের সন্ধানে

প্রবীর বসু

২৫

সালফারের চাঁদ

আবু হানিফ শেখ

২৬ নদীকথা

মহানন্দা কথা

ড. সৌমিত্র চৌধুরী

২৮ আন্তর্জাতিক আলোক দিবস-২০২৪

ড. অসিত ঘোষ

২৯ চিঠি : রনজিৎ পাল

৩০

রেখা দাঁ ও বিজ্ঞান আন্দোলন

ড. দীপাঞ্জন দে

৩০

চিঠি-২

৩১

প্রবন্ধ : জগদীশচন্দ্র বসু

সম্রাজ্ঞী দাস

৩য় প্রচ্ছদ : ছাত্রীদের ছবি অঙ্কণ

৪র্থ প্রচ্ছদ : যারা হারিয়ে যাচ্ছে

ড. রাজা রাউত

প্রচ্ছদ কথা ১ : নোবেল : চিকিৎসাবিজ্ঞান

ড. তুষার কান্তি নাথ

# ক্ষুদ্র আর. এন. এ. বৃহৎ আবিষ্কার

*Micro-RNA একপ্রকার ক্ষুদ্র, নন-কোডিং RNA যা ট্রান্সক্রিপশন পরবর্তী জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। অন্য কোন নির্দিষ্ট জিন থেকে উৎপন্ন m-RNA এর নিউক্লিওটাইড ক্রমের সঙ্গে micro-RNA এর নিউক্লিওটাইড ক্রমের পরিপূরকতার জন্য তারা পরস্পর বাইন্ড করে এবং m-RNA এর কার্যকারিতা বিনষ্ট করে। এই অভিনব জিন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আবিষ্কারেরই স্বীকৃতি পেলেন ভিক্টর অ্যামব্রোজ এবং গ্যারি রুভকুন, ২০২৪ সালের নোবেল জয়ের মাধ্যমে।*

সময়টা ছিল সত্তরের দশকের শেষ ভাগ এবং আশির দশকের প্রথমার্ধ। ম্যাসাচ্যুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-র নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক রবার্ট হোরভিটজ্-এর গবেষণাগারে পৃথকভাবে 'পোস্ট ডক্টোরাল রিসার্চ' করতে এলেন দুই তরুণ গবেষক, ভিক্টর অ্যামব্রোজ এবং গ্যারি রুভকুন। দুই তরুণের গবেষণার মূল বিষয় ছিল *Caenorhabditis elegans* নামক এক ক্ষুদ্র (দৈর্ঘ্য এক মিলিমিটার) গোলকৃমির জিনের ক্রিয়াকলাপ অনুসন্ধান। পরবর্তীতে এই বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী গবেষণার ফসল হিসাবে ১৯৯৩ সালে বিখ্যাত 'সেল' পত্রিকায় অ্যামব্রোজ এবং রুভকুন অন্যান্য সহ-লেখকের সাথে পৃথকভাবে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আবিষ্কৃত হয় একপ্রকার ক্ষুদ্র, নন-কোডিং RNA যা ট্রান্সক্রিপশন পরবর্তী জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে, পরিভাষায় যাকে বলে micro-RNA (m-RNA)। এই আবিষ্কারের জন্যই ২০২৪ সালে 'ফিজিওলজি বা মেডিসিন' বিভাগে নোবেল প্রাইজ পেলেন দুই আমেরিকান বায়োলজিস্ট ভিক্টর রবার্ট অ্যামব্রোজ এবং গ্যারি ব্রুস রুভকুন।

### ভিক্টর অ্যামব্রোজ

১৯৫৩ সালের পয়লা ডিসেম্বর নিউ হ্যাম্পশায়ারের হ্যানভারে ভিক্টর অ্যামব্রোজ জন্মগ্রহণ করেন। বাবা লঙ্গিন অ্যামব্রোজ পোল্যান্ড থেকে রিফিউজি হিসাবে আমেরিকায় আসেন। মা হেলেন কোপফিল্ড। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে ভারমোন্টের পারিবারিক ডেয়ারী ফার্মে। ম্যাসাচ্যুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ১৯৭৫ সালে তিনি বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। ম্যাসাচ্যুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক ডেভিড বাল্টিমোরের তত্ত্বাবধানে তিনি ১৯৭৯ সালে ডক্টোরাল ডিগ্রী পান। বিষয় ছিল পোলিও ভাইরাসের জিনোম এবং তার প্রতিলিপিকরণ সম্বন্ধে অধ্যয়ন। তাঁর 'পোস্ট ডক্টোরাল রিসার্চ' সম্পন্ন হয়েছিল অধ্যাপক রবার্ট হোরভিটজ্-এর অধীনে। বিষয় ছিল *C. elegans* নামক গোলকৃমির গঠনগত বিকাশের জেনেটিক পর্যালোচনা। ১৯৮৪ সালে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। অ্যামব্রোজ পরবর্তীতে ডার্টমাউথ কলেজে (১৯৯২ সালে) এবং ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচ্যুসেটস্ মেডিকেল স্কুলে (২০০৮ সালে) অধ্যাপনা ও গবেষণা করেন। বর্তমানে তিনি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচ্যুসেটস্ মেডিকেল স্কুলে সিলভারম্যান প্রফেসর হিসেবে কর্মরত।

### গ্যারি রুভকুন

গ্যারি রুভকুন ক্যালিফর্নিয়ার বার্কলে শহরের এক ইহুদি পরিবারে ১৯৫২ সালের ২৬ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। বাবা স্যামুয়েল এবং মা ডোরা রুভকুন। ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৩ সালে তিনি বায়োফিজিক্সে বিএ পাস করেন। পরবর্তীতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রেডারিক এম আশুবেলের তত্ত্বাবধানে ১৯৮২ সালে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল ব্যাকটেরিয়ার নাইট্রোজেন ফিক্সেশনে জিনগত ভূমিকা। ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির নোবেল জয়ী অধ্যাপক রবার্ট হোরভিটজ-এর গবেষণাগারে *C. elegans*-এর ওপর তিনি 'পোস্ট ডক্টোরাল রিসার্চ' করেন। কিছুদিনের জন্য তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াল্টার গিলবার্টের অধীনেও গবেষণা করেন। পরবর্তীতে তিনি ম্যাসাচ্যুসেটস্ জেনারেল হসপিটালে প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর পদে আসীন হন। বর্তমানে রুভকুন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের জেনেটিক্সের অধ্যাপক।

### দ্যা সেন্ট্রাল ডগমা

প্রত্যেক জীবদেহের কোষের মধ্যে অবস্থিত জিন অর্থাৎ DNA-র নিউক্লিওটাইড ক্রমের মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত থাকে (ব্যতিক্রম কিছু RNA ভাইরাস)। DNA-র মধ্যে অবস্থিত এই বংশগত তথ্য ট্রান্সক্রিপশন পদ্ধতিতে মেসেঞ্জার RNA-র (m-RNA) মধ্যে সঞ্চারিত হয়। m-RNA-র নিউক্লিওটাইড ক্রমের ওপর ভিত্তি করে ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষ সংঘটিত হয়, যা জীবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। একেই সেন্ট্রাল ডগমা বলে। অর্থাৎ DNA-র নিউক্লিওটাইড ক্রমের ওপর ভিত্তি করেই জীবের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে।

জীবদেহের প্রতিটি কোষে একই সংখ্যক এবং একই প্রকৃতির ক্রোমোজোম থাকে যার মধ্যে সমপ্রকৃতির জিনসমূহ অবস্থান করে। তবুও দেহের বিভিন্ন ধরনের কোষে (যেমন স্নায়ু কোষ, পেশি কোষ ইত্যাদি) ভিন্ন ভিন্ন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কিভাবে প্রকাশিত হয়? এর উত্তর হল, জিন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার কোষে বিভিন্ন প্রকারের জিন সক্রিয় থাকে এবং বাকি জিনগুলি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করে। সত্তরের দশক পর্যন্ত এটা জানা ছিল যে, প্রোটিন জাতীয় বিভিন্ন ট্রান্সক্রিপশনাল ফ্যাক্টর DNA-এর নির্দিষ্ট অংশে সংযুক্ত হয় এবং কোন প্রকার m-RNA তৈরি হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।

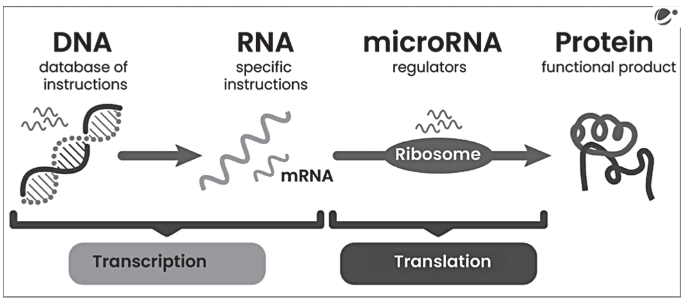


চিত্র : ১. DNA m-RNA এবং প্রোটিনে বংশগত তথ্যের সঞ্চারণ। (সৌজন্যে : Nobel Prize outreach)

## মাইক্রো আর এন এ আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত

আশির দশকের গোড়ার দিকে ভিক্টর অ্যামব্রোজ এবং গ্যারি রুভকুন ম্যাসাচ্যুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে তাদের পোস্ট ডক্টোরাল গবেষণায় *C. elegans* নামক গোলকৃমির দুটি স্ট্রেন, lin-৪ এবং lin-১৪ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। অ্যামব্রোজ লক্ষ্য করলেন যে, lin-৪ জিন, lin-১৪ জিনের কার্যকারিতা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু কিভাবে ঘটে তা অজানা ছিল।

পরবর্তীতে অ্যামব্রোজ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং এর কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন যে lin-৪ জিন এক অস্বাভাবিক ছোট (২২nt) RNA অণু তৈরি করে যা প্রোটিন সংশ্লেষ করে না। এই প্রকার RNA-কে micro-RNA নামে চিহ্নিত করা হয়। তিনি অনুমান করলেন এই বিশেষ ধরনের RNA-ই lin-১৪ জিনের কার্যকারিতা বন্ধের জন্য দায়ী। কিন্তু কিভাবে?

অন্যদিকে, রুভকুন ম্যাসাচ্যুসেটস্ জেনারেল হসপিটাল অ্যান্ড হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের নিজস্ব গবেষণাগারে পর্যবেক্ষণ করলেন যে, lin-১৪ জিনের m-RNA এর কার্যকারিতাকে lin-৪ জিন থেকে তৈরি micro-RNA বাঁধা দান করে এবং lin-১৪ জিনের m-RNA থেকে প্রোটিন সংশ্লেষ বন্ধ করে দেয়। আদতে lin-১৪ জিন থেকে তৈরি m-RNA এর নিউক্লিওটাইড ক্রমের সাথে ওই micro-RNA এর ক্রমের পরিপূরকতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে, lin-৪ জিন থেকে তৈরি ওই micro-RNA, lin-১৪ জিন থেকে সৃষ্ট m-RNA এর সঙ্গে বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়। তাই জিনের কার্যকারিতা বন্ধ হয়ে যায়। অ্যামব্রোজ এবং রুভকুনের এই অভূতপূর্ব গবেষণা এক নতুন জিন নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোকপাত করল।

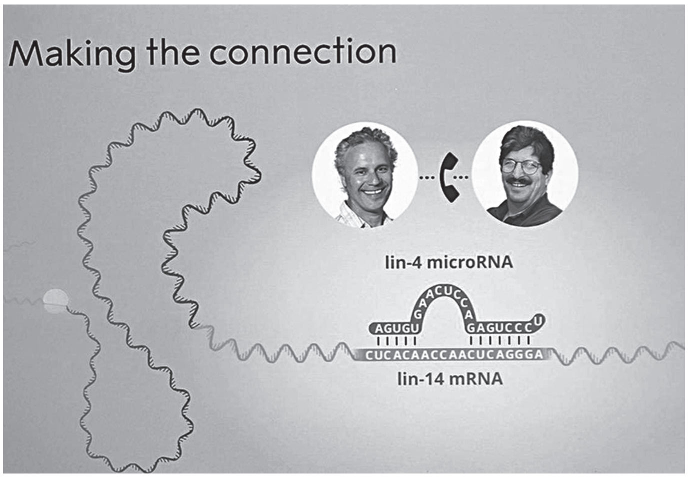


চিত্র : ২. A. *C. elegan* lin-৪ জিন থেকে উৎপন্ন m-RNA, lin-১৪ জিন থেকে উৎপন্ন m-RNA-র ক্রমের পরিপূরক। ফলে তারা পরস্পর যুক্ত হয়ে lin-১৪ জিনের কার্যকারিতাকে বিনষ্ট করে।

(সৌজন্যে : Nobel Prize outreach)

চিত্র : ৩. Micro-RNA-র অভূতপূর্ব আবিষ্কার ছিল অপ্রত্যাশিত এবং জিন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। (সৌজন্যে : Nobel Prize outreach)

## মাইক্রো আর এন এ এর সার্বজনীনতা

কিন্তু এই নতুন ধরনের জিন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কি সার্বজনীন, না কেবলমাত্র C. elegans নামক গোলকৃমিতেই দেখা যায়? ২০০০ সালে রুভকুন আরো একপ্রকার micro-RNA পর্যবেক্ষণ করেন যা let-৭ জিন থেকে উৎপন্ন হয়। মজার কথা হলো, এই let-৭ জিন অতি সংরক্ষণশীল এবং প্রাণীজগতের সকল জীবদেহে বর্তমান। পরবর্তীতে বিভিন্ন জীবদেহেও বিভিন্ন micro-RNA আবিষ্কৃত হয়েছে। এমনকি মানবদেহে এক হাজারেরও বেশি micro-RNA-এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ এই নতুন ধরনের জিন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সকল বহুকোষী উন্নত জীবদেহেই লক্ষ্য করা যায়। অনিয়ন্ত্রিত micro-RNA, বিভিন্ন রোগ যেমন কিডনির রোগ, ক্যান্সার, নিউরোলজিক্যাল রোগ, শ্বাসজনিত অসুখ ইত্যাদির কারণ হতে পারে। আবার বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের জিন থেরাপির ক্ষেত্রেও micro-RNA গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

এই অভিনব জিন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আবিষ্কারেরই স্বীকৃতি পেলেন ভিক্টর অ্যামব্রোজ এবং গ্যারি রুভকুন, ২০২৪ সালের নোবেল জয়ের মাধ্যমে।

## তথ্যসূত্র


1. Lee RC, Feinbaum RL, Ambros V. The C. elegans heterochronic gene lin-4 encodes small RNAs with antisense complementarity to lin-14. Cell. 1993; 75(5) : 843-854. doi : 10.1016/0092-8674(93)90529-y
2. Pasquinelli AE, Reinhart BJ, Slack F, Martindale MQ, Kurodak MI, Maller B, Hayward DC, Ball EE, Degnan B, Müller P, Spring J, Srinvasan A, Fishman M, Finnerty J, Corbo J, Levine M, Leahy P, Davidson E, Ruvkun G. Conservation of the sequence and temporal expression of let-7 heterochronic regulatory RNA. Nature. 2000; 408(6808) : 86-89. doi : 10.1038/35040555
3. Press release. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Wed. 9 Oct. 2024
4. Roy B, Ghose S, Biswas, S. Therapeutic strategies for miRNA delivery to reduce hepatocellular carcinoma, Seminars in Cell & Developmental Biology, Volume 124, 2022, Pages 134-144, ISSN 1084-9521, https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2021.04.006.
5. Wightman B, Ha I, Ruvkun G. Posttranscriptional regulation of the heterochronic gene lin-14 by lin-4 mediates temporal pattern formation in C. elegans. Cell. 1993;75(5):855-862. doi : 10.1016/0092-8674(93)90530-4


**লেখক শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক**

*e-mail: tushar_kly@rediffmail.com • M. 9635547188*

ড. তপন দাস

# এসো প্রোটিনের নকশা খুঁজি

কোভিড কালে আট দশ মাসের মধ্যেই খবরের কাগজে ভেসে এলো কোভিডের টিকা আবিস্কার প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে বিজ্ঞানীরা। বড় বিস্ময় জেগেছিল মনে। মনে করিয়ে দিয়েছিল লুই পাস্তুরের কথা অথবা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর কথা। তাদের টীকা আবিষ্কার এতটা চটজলদি হয়নি। তাহলে এখন কীভাবে সম্ভব হচ্ছে? এসব প্রশ্নের অনেকটা উত্তর যেন পাওয়া যায় চলতি বছরের বেশকিছু নোবেল জয়ীর কার্যকলাপ বিশ্লেষণে। এবারে রসায়নের নোবেল ত্রয়ীরা নতুন ধরণের প্রোটিন তৈরি এবং প্রোটিনের গঠন নির্ণয়ের নতুন দিক নিয়ে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। রসায়নে নোবেল জয়ীরা হলেন ডেভিড বেকার, ডেমিস হাসাবিস এবং জন এম জাম্পার। একদিকে ডেভিড বেকার প্রোটিনের কম্পিউটার ভিত্তিক নকশার জন্য সম্মানিত হয়েছেন অন্যদিকে অপর দুই বিজ্ঞানী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে প্রোটিনের জটিল গঠনের নকশা তৈরি করেছেন।

জীবের রসায়ন চর্চা করা কি সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আগে জানতে হবে প্রোটিন সম্পর্কে। কারণ প্রোটিনই হচ্ছে অন্যতম যন্ত্র যার মাধ্যমে জীবের রসায়ন-চর্চা অনেকাংশে সম্ভব। জীবকোশ এবং তার চারপাশের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে প্রোটিন। উদ্ভিদ ও প্রাণী কোশের প্রোটোপ্লাজমে নাইট্রোজেন ঘটিত কতগুলো জটিল পদার্থ অবস্থান করে। প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যই শুধু নয়, জীবদেহের বিভিন্ন অংশ সৃষ্টিতে, প্রাণীদেহে অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিবহণে, বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে এমনকি জিনের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রনে প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কোন দুর্ঘটনায় কোন ব্যক্তির পেশী বা হাড় ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেই ক্ষত মেরামত করতে প্রয়োজন হয় প্রোটিনের। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী মুলার এই গুরত্বপূর্ণ পদার্থ গুলোর নাম দিয়েছিলেন প্রোটিন। রাসায়নিক বিচারে প্রোটিন হল আলফা অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রকৃতিজাত পলিমার। প্রোটিন প্রশম পদার্থ এবং আর্দ্র-বিশ্লেষণে অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে। একটি কোশে, অগণিত প্রোটিন বিল্ডিং ব্লক এবং মুখ্য শ্রমিকের কাজ করে চলেছে। প্রোটিন দেখতে সহায়তা করছে, পেশীর সঞ্চালনে, জৈবিক ক্রিয়ায় অনুঘটকের ভূমিকায়, কখনও অ্যান্টিবডির ভূমিকা নিয়ে রোগ প্রতিরোধে আবার কখনও হরমোন হিসেবেও কাজ করে প্রোটিন। দুটি কার্যকরীমূলক (অ্যামিনো এবং কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড) সম্মিলিত প্রোটিন অনুর গঠন বড়ই জটিল। আর জটিল গঠনের কিনারা করতেই সচেষ্ট হয়েছেন এই তিন বিজ্ঞানী। নতুন প্রোটিন বিভিন্ন ড্রাগ, ভ্যাকসিন, প্রয়োজনীয় পদার্থ এবং সেন্সর তৈরিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

প্রোটিনে উপস্থিত অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো ২০ ধরনের হয়। তাদের শৃঙ্খলের উপর নির্ভর করে প্রোটিনের প্রকৃতি আলাদা আলাদা হয়। ডেভিড বেকার শৃঙ্খলের রদবদল ঘটিয়ে নতুন ধরণের প্রোটিন তৈরি করেন। নতুন প্রোটিনের চরিত্র অন্যগুলির থেকে অনেকটাই আলাদা। জীবদেহের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের মূল ভিত্তি হল প্রোটিন। একটি ইটের বাড়ি বানাতে গেলে প্রত্যেকটি ইট একটি ব্লকের কাজ করে, ঠিক তেমনি অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো প্রতিটিই একেকটি ব্লক। ডেভিড বেকার ২০০৩ সালেই কম্পিউটারের উপর নির্ভর করে অ্যামাইনো অ্যাসিড ব্লকগুলোকে বিভিন্ন সজ্জায় সাজিয়ে প্রোটিনের নতুন নকশা তৈরির কাজ করেছেন।

### ডেভিড বেকার (DAVID BAKER)

১৯৭২ সালের রসায়নে তিনজন নোবেল জয়ীর একজন হলেন ক্রিশ্চিয়ান অ্যানফিনসেন। ১৯৬১ সালের দিকেই প্রোটিন নিয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক পর্যালোচনা করে প্রোটিনের ভাঁজ খুলে আবার ঠিক একই রকম ভাঁজে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। তার উদ্ভাবিত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিডের ক্রমের উপর ভিত্তি করে প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক গঠনের নকশা বানানো সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু অ্যানফিনসেনের যুক্তিকে আংশিক সত্য বলে তুলে ধরেছিলেন অপর অ্যামেরিকান বিজ্ঞানী সাইরাস লেভিন্থাল। কারণ হিসেবে তিনি বললেন অ্যানফিনসেনের যুক্তিকে পুরোপুরি মেনে নিলে ১০০ অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে $১০^{৪৭}$ সংখ্যক প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক গঠন সম্ভব। শৃঙ্খলে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো যদি অনবরত ভাঁজ সৃষ্টি করে তাহলে প্রোটিনের সঠিক গঠন নির্ণয় করা প্রায় অকল্পনীয়। কিন্তু একটি কোশে কয়েক মিলিসেকেন্ডের মধ্যে এইরূপ গঠন সৃষ্টি হলে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো কিভাবে ভাঁজ সৃষ্টি করবে, একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। একদিকে অ্যানফিনসেনের যুক্তি অন্যদিকে সাইরাসের পাল্টা যুক্তিকে মাথায় রেখে ডেভিড বেকার নতুনের সন্ধানে নেমে পড়েছিলেন সেইদিন। নতুন ভিন্নধর্মী প্রোটিনের জন্মদাতা ডেভিড। প্রোটিনের জটিল গঠন সম্পর্কে ধারনা পেতে শুধুমাত্র এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফি যথেষ্ট ছিল না এবং সেটা অনেক সময়সাপেক্ষও ছিল। সম্ভাব্য গঠন কী হতে পারে? সেটা নির্ধারণ করা জীবরসায়নের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চ্যালেঞ্জকে মাথায় নিয়েই গবেষকের দল শুরু করেছিলেন Critical Assessment of Protein Structure Prediction (CASP) শিরোনামে নতুন

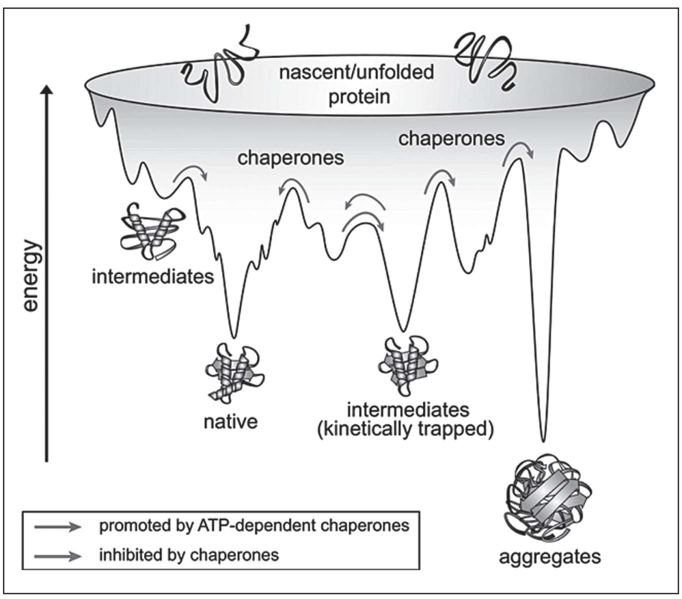

প্রোজেক্ট। ডেভিড এবং তার সহকর্মীরা সমান্তরাল প্রতিযোগিতায় ছিলেন তাদের সঙ্গে। ২০১৮ সালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সঙ্গে নিয়ে নতুন সফটওয়্যার সৃষ্টি করলেন।

ইউনাইটেড স্টেটস্-এর পশ্চিম সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি শহর সিয়াটল (Seattle)। সেখানেই ১৯৬২ সালের ৬ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন ডেভিড বেকার। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক বেশ কিছু জীবপ্রযুক্তির কোম্পানির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন এবং ইউনাইটেড স্টেটস্ ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সাইন্সের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সিয়াটলের গারফিল্ড হাইস্কুলের ছাত্র নতুন প্রোটিন তৈরি করে আজ বিশ্ববন্দিত। হাইস্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে একে একে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি সম্পন্ন করে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে থেকে পিএইচডি করেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সানফ্রানসিসকোতে ডেভিড আগার্ডের তত্ত্বাবধানে বায়োফিজিক্সের উপর পোস্ট ডক্টরাল ট্রেনিং করেছেন। ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন স্কুল অফ মেডিসিনের ফ্যাকাল্টি হিসেবে। সেখান থেকে ২০০০ সালে যোগ দেন হাওয়ার্ড হিউজেস মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে। ২০০৯ সালে তিনি অ্যামেরিকান অ্যাকাডেমি অফ আর্টস অ্যান্ড সাইন্সে ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি রোজেটা কমন্স নামের একটি গবেষক-পরীক্ষাগার কনসোর্টিয়ামের পরিচালক, যেটি জৈব-আণবিক কাঠামো পূর্বাভাস ও নকশাকারক সফটওয়্যার নির্মাণ করে। বেকার প্রোটিন কাঠামো পূর্বাভাসের যে সমস্যাটিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন, সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে গুগলের উপসংস্থা ডিপমাইন্ড আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের অপর একজন বায়োকেমিস্ট হ্যানলে রাওহলা বেকারকে বিয়ে করেছেন এবং রয়েছে তাদের দুই সন্তান।

তার এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ডেভিড আগার্ড, যার তত্ত্বাবধানে পোস্ট ডক্টরাল ট্রেনিং করেছেন। নোবেল কমিটি ডেভিড বেকারকে নির্বাচন করে একেবারেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলেও তিনি মত প্রকাশ করেছেন। তার মতে এই নতুন প্রকৌশল ক্যান্সার সহ বেশ কিছু দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ে নতুন দিশা দেখাবে, যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে ফার্মাসিউটিক্যাল এবং ঔষধ শিল্পে।

হেইনার লিঙ্ক (Heiner Linke, Chair of the Nobel Committee for Chemistry) বলেছেন এবারের নোবেলজয়ীরা প্রায় ৫০ বছরের একটি পুরনো স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। ডেভিড বেকারের সঙ্গে জুড়ে আছে গুগল ডিপমাইন্ডের দুই তরুণ ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডেমিস হাসাবিস এবং জন এম জাম্পার। ১৯০টি দেশের প্রায় দুই কোটি মানুষের ২০০ কোটি প্রোটিনের গঠন সম্পর্কে ধারণা দিতে সম্ভব হয়েছে ডেমিস হাসাবিস এবং জন এম জাম্পারের গবেষণার মধ্যদিয়ে। প্রোটিনের সম্ভাব্য গঠন কি হতে পারে তার আন্দাজ পেতে ২০২০ সালে তারা আবিষ্কার করেন একটি এআই মডেল (AI-Artificial Intilligence) AlphaFold2।

প্রোটিনে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো নির্দিষ্ট ক্রমে আবদ্ধ থেকে বহু ভাঁজযুক্ত ত্রিমাত্রিক গঠন উৎপন্ন করে। ১৯৭০ সালের দিকেই বিজ্ঞানীরা এই গঠনের পূর্বাভাস খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই অসাধ্য সাধন হয়েছে বলা চলে বছর চারেক আগে। রয়েছে এর অগণিত বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ। গবেষকেরা সহজেই অনুমান করতে পারে একটি অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতিরোধ ক্ষমতা। একটি এনজাইমের প্রতিবিম্ব তৈরি করে জৈব অভঙ্গুর প্লাস্টিককে ভঙ্গুর করে তুলতে পারবে বলে আশাবাদী বিজ্ঞানী মহল।

আটচল্লিশ বছর বয়সী ডেমিস হাসাবিস উত্তর লন্ডনেই বেড়ে উঠেছেন। ছোটবেলায় অনেকটা শিক্ষাই অর্জন করেছেন গ্রীক সাইপ্রিয়ট বাবা এবং চিনা মায়ের থেকেই। ছোটবেলা থেকেই দাবার চালটা ভালো দিতে পারতেন। ইংল্যান্ডের একাধিক জুনিয়র দাবা দলের অধিনায়কও ছিলেন তিনি। একটি দাবা প্রতিযোগিতায় জিতে প্রাপ্ত অর্থমূল্য দিয়ে খরিদ করেছিলেন একটি কম্পিউটার। শুরু হল দাবার চালের পাশাপাশি বই থেকে প্রোগ্রামিং শেখা। হাসাবিস কেম্ব্রিজের কুইন্স কলেজ থেকে ১৯৯৭ সালে স্নাতক হন। কেম্ব্রিজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর, হাসাবিস লায়নহেড স্টুডিওতে কাজ করেন। গেম ডিজাইনার পিটার মলিনেক্স, যার সাথে হাসাবিস বুলফ্রগ প্রোডাকশনে কাজ করেছিলেন। লায়নহেডে, হাসাবিস ২০০১ সালের গড গেম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট-এ লিড এআই প্রোগ্রামার হিসেবে কাজ করেছেন। মাঝে কাজ করেছেন এলিক্সির স্টুডিওতে। এলিক্সির স্টুডিওর পরে, হাসাবিস ২০০৯ সালে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (ইউসিএল) থেকে স্নায়ুবিজ্ঞানে একটি বিশেষ বিষয়ের উপর পিএইচডি করার জন্য শিক্ষাজগতে ফিরে আসেন। তিনি নতুন এআই অ্যালগরিদমের জন্য মানুষের মস্তিষ্কে অনুপ্রেরণা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। ল্যাবে ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি) এবং হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌথভাবে পরিদর্শনকারী বিজ্ঞানী হিসাবে যুক্ত হলেন। তিনি স্নায়ুবিজ্ঞান এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত গবেষণা চালিয়ে ২০০৯ সালে ইউসিএল-এ পিটার দায়ানের সাথে কাজ করেন। কল্পনা, স্মৃতিশক্তি এবং স্মৃতিভ্রংশের ক্ষেত্রে কাজ করে বিজ্ঞানের জগতে এক অনন্য নজির গড়েছেন তিনি। ২০১০ সালে হাসাবিস ডিপমাইন্ডের সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও। বর্তমানে এটি গুগলের অধিনস্ত। বিভিন্ন আকাশচুম্বী কাজের মধ্যে একটি হল ডিপমাইন্ড তার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় প্রোটিন ফোল্ডিং-এ পরিণত করেছে। এমনকি এটির 1D অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্স থেকে প্রোটিনের 3D কাঠামোর পূর্বাভাস দিতে সক্ষম। এটি জীববিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, যেহেতু প্রোটিন জীবনের জন্য অপরিহার্য, প্রায় প্রতিটি জৈবিক ফাংশন তাদের উপর নির্ভর করে এবং প্রোটিনের কাজ গঠনের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। ডিসেম্বর ২০১৮-এ, ডিপমাইন্ডের টুল আলফাফোল্ড ৪৩টি প্রোটিনের মধ্যে ২৫টির জন্য সফলভাবে সবচেয়ে সঠিক কাঠামোর ভবিষ্যদ্বাণী করে প্রোটিন স্ট্রাকচার প্রেডিকশনের জন্য ১৩তম ক্রিটিকাল অ্যাসেসমেন্ট অফ টেকনিকস (CASP) জেতে।

### ডেমিস হাসাবিস (DEMIS HASSABIS)

তবে ১৪তম CASP জেতে ডিপমাইন্ডের অপর বিজ্ঞানী জন মাইকেল জাম্পার। জাম্পার ২০০৭ সালে ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যা এবং গণিতে মেজর সহ বিজ্ঞানের স্নাতক, মার্শাল স্কলারশিপে ২০১০ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঘনপদার্থবিজ্ঞানে এমফিল করেন। ২০১২ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাত্ত্বিক রসায়নে বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর এবং ২০১৭ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাত্ত্বিক রসায়নে ডক্টর অফ ফিলোসফি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ডক্টরেট উপদেষ্টা ছিলেন টবিন সোসনিক এবং কার্ল ফ্রিড। জাম্পারের গবেষণা অ্যালগরিদম কিভাবে প্রোটিন গঠনের পূর্বাভাস দিতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করে।

আলফাফোল্ড হল একটি ডিপ লার্নিং অ্যালগরিদম যা জাম্পার এবং তার দল ডিপমাইন্ড-এ তৈরি করেছে। এটি একরকম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

প্রোগ্রাম যা প্রোটিন গঠনের পূর্বাভাস দেয়। পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত নিয়ে পড়তে পড়তেই একসময় ঢুকে প্রোটিনের গঠন পূর্বাভাস নির্ণয়ে। ২০১১ সালে তিনি যখন ফিজিক্স নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণা করছিলেন তখনই তার মনে দানা বাঁধে হয়তো প্রোটিনের গঠন নির্ণয় সম্ভব হবে। সুপার কম্পিউটার এবং তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার সহায়তায় যখন তিনি প্রোটিনের অনুকরণ করার চেষ্টা করছিলেন তখনই তার মনে হয়েছিল এই পদ্ধতি মেডিক্যালের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। অচিরেই তিনি তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন আলফাফোল্ড-২-এর হাত ধরে।

**জন মাইকেল জাম্পার (JOHN JUMPER)**

প্রোটিনগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের শৃঙ্খল নিয়ে গঠিত যা প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক (3-D) কাঠামো গঠনের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাঁজ সৃষ্টি করে। প্রোটিনের জৈবিক ফাংশন বোঝার জন্য ত্রিমাত্রিক গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি, ক্রায়ো-ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপি এবং নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্সের মতো কৌশলগুলির মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে প্রোটিন গঠন নির্ধারণ করার থেকে আরও অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়েছে তারা।

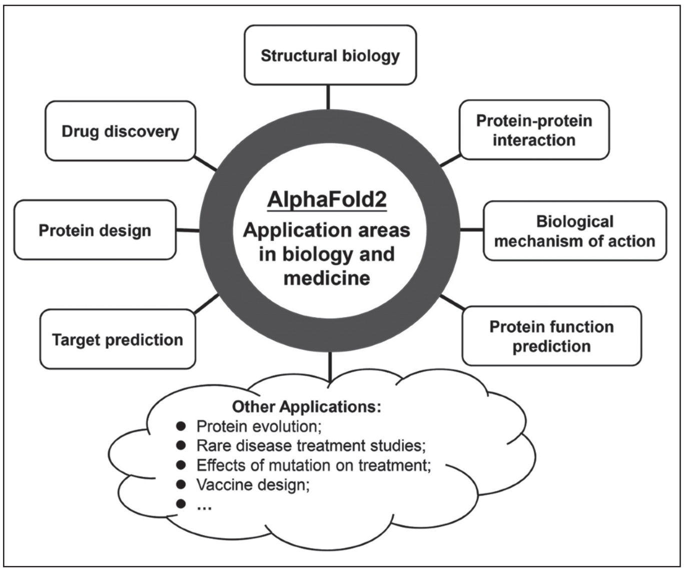


কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে ভবিষ্যৎ বাণী করে? আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে মেশিন লার্নিং। মেশিন লার্নিং হল AI-এর জন্য একটি বিশাল ডেটাসেটে প্যাটার্ন শেখার উপায়। AI-কে বিদ্যমান ডেটার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারপর বিশেষ কতগুলো চিহ্নিত হওয়া নিদর্শন ব্যবহার করে নতুন উদাহরণের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারে। AlphaFold-2 হল একটি কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের উদাহরণ। এটি সিমুলেটেড নোডের একটি সংগ্রহ, যা সংযোগ দ্বারা সংযুক্ত যা শক্তিশালী বা দুর্বল করা যেতে পারে। এই জাতীয় নেটওয়ার্কগুলি মেশিন লার্নিংয়ে পারদর্শী হতে পারে। যেহেতু আলফাফোল্ডের নেটওয়ার্কে নোডের একাধিক স্তর রয়েছে, এটিকে ‘গভীর শিক্ষা’ (Deep learning) অ্যালগরিদম হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এইভাবে AlphaFold2 যা একটি মাল্টিকম্পোনেন্ট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সিস্টেম যা একটি প্রোটিনের 3D কাঠামোর প্রাথমিক অ্যামাইনো অ্যাসিড ক্রমঅনুসারে ভবিষ্যদ্বাণী করতে মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে। এটি কোনো টেমপ্লেট স্ট্রাকচার ব্যবহার না করেই সফলভাবে কাজ করতে পারে এবং এমনকি পূর্বে অজানা প্রোটিন ভাঁজগুলির পূর্বাভাসও দিতে পারে। AlphaFold-2 একটি অভিনব প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড ক্রম নেয় এবং এটিকে অন্যান্য অনুরূপ প্রোটিনের অনুক্রমের সাথে সারিবদ্ধ করে। এটি অনুক্রমের অংশগুলিকে চিহ্নিত করে প্রোটিনের 3D কাঠামোতে মিথস্ক্রিয়ার সম্ভাব্য পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে AlphaFold-2 অনুক্রমের 3D কাঠামোর একটি ভবিষ্যৎবাণী উপস্থাপন করে।

জীববিজ্ঞানের সাথে রসায়নের একটা নিবিড় সম্পর্ক অনেক আগে থেকেই জানা ছিল কিন্তু পদার্থবিদ্যাও প্রাণরসায়নে এতটা জায়গা দখল করবে সেটা হয়তো অনেকেরই জানা ছিল না। এবারের রসায়নে নোবেল জয়ীদের জীবনচর্চাতেও লক্ষ্য করা যায়, এরা প্রত্যেকেই ছিলেন পদার্থবিদ্যায় আগ্রহী মানুষ। কিন্তু নিজেদের মধ্যে সঞ্চার করলেন প্রাণ রসায়ন। দুটি প্রকৌশল RoseTTAFold এবং AlphaFold-2 উদ্ভাবন করলেন তারা। এই দুই কৌশল একদিকে যেমন প্রোটিনের নকশা খুঁজে দিয়েছে অন্যদিকে রোগ নির্ণয় এবং তার নিরাময়ে যুগান্তকারী দিক দেখিয়েছে বিশ্ববাসীকে। সব ভালোর কিছু খারাপ দিকও থাকে। আমরা শুধু বেছে নেব আলোকিত পথটি।

**তথ্যসূত্র**

১. Royel Swedish academi of sciences
২. Wikipedia

**লেখক প্রধান শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক**
*e-mail: tdcob25@gmail.com • M. 8944996755*

**বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার কর্মসূচী—২০২৪**
**পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। স্থান : পলাশী এ.ডি.পি. গার্লস হাইস্কুল**

অ নি ন্দ্য দে

# তথ্যের ভিড়ে নকশার খোঁজে

কম্পিউটার ব্যবহার করে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা বা কোনও ছবিকে বিশ্লেষণ করে তাকে পরিমার্জন করার কায়দা-কানুনগুলো এখন অনেকের কাছেই খুব পরিচিত। সুবিশাল তথ্যপুঞ্জ ঝাড়াই-বাছাই করে তাদের বিশ্লেষণ করার কাজেও এই ধরনের প্রযুক্তি বেশ কিছুদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আসছে। গত পনেরো-কুড়ি বছর ধরে আবার মেশিন লার্নিং মানে কম্পিউটারকে প্রশিক্ষিত করে তোলার একটা প্রচেষ্টাও ক্রমশ দানা বাঁধছে। একেবারে হাল আমলে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার স্বপ্ন।

কিন্তু প্রশ্ন হল আমরা যে প্রথাগত সফ্‌ট্‌ওয়্যার ব্যবহার করে আসছি তার সঙ্গে এই মেশিন লার্নিং-এর মূল পার্থক্যটা কোথায়? শুরুতে বরং সেটাই একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক। প্রথাগত সফ্‌ট্‌ওয়্যারের কাজ অনেকটা রান্না করার মতো। আমরা যেমন উপযুক্ত পরিমাণে চাল, দুধ, চিনি মিশিয়ে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পায়েস তৈরি করি, সফ্‌ট্‌ওয়্যারও ঠিক সেরকমভাবেই বিশেষ কোনও উৎস থেকে তথ্য নিয়ে, নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে ঐ তথ্য থেকে একটা ফলাফল তৈরি করে। মেশিন লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু কম্পিউটারকে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয় উদাহরণের সাহায্যে। ছবি দেখে একটা ফুল বা একজন মানুষকে চিনে নিতে পারার মতো যে-সমস্যাগুলো সমাধান করার কায়দা-কানুন ধাপে ধাপে নির্দেশ দিয়ে শেখানো খুব সহজ নয়, সেই ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করতে কম্পিউটারকে সক্ষম করে তোলা হয়।

তাহলেও কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। কারণ, কম্পিউটার তো আর চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না; শুধুমাত্র আমাদের স্মৃতি বা শিক্ষাগ্রহণের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলোকে নকল করতে পারে। তাহলে অবধারিতভাবেই যে-প্রশ্নটা উঠে আসে সেটা হল : কম্পিউটারকে কোনও বিষয় আমরা শেখাবো কীভাবে? এখানে তাহলে মেশিন লার্নিং-এর সেই ইতিহাসটাতেই একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি।

গত শতকের চার-এর দশকে বিজ্ঞানীরা মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ বা নিউরন এবং তাদের সংযোগকারী সাইন্যাপ্স-এর নেটওয়ার্ক যেভাবে কাজ করে, গাণিতিক পদ্ধতিতে তার একটা ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। ওয়ারেন ম্যাককুলক ও ওয়াল্টার পিট[1]-এর উদ্যোগে মানুষের মস্তিষ্কে পরস্পর সংযুক্ত নিউরনের মাধ্যমে কীভাবে জটিল নকশা তৈরি হয়, সেটা বোঝার চেষ্টা চলছিল। তাদের এই গবেষণার সূত্র ধরেই শুরু হল এক নতুন স্বপ্ন দেখা: কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক (artificial neural network) গড়ে তোলার স্বপ্ন। আজকের মেশিন লার্নিং-এর যাবতীয় কার্যকলাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে এই কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক-এর কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই।

মনোবিজ্ঞানের আরেকটা বড় ধাঁধা হল : মস্তিষ্ক কোনও একটা বিষয় শেখে কীভাবে। চারের দশকের শেষের দিকে সে ব্যাপারে একটা অনুমান সূত্র তৈরি করেছিলেন স্নায়ুবিজ্ঞানী ডোনাল্ড হেব।[2] তিনি দেখালেন, একাধিক নিউরন যখন একসাথে কাজ করে, তখন তাদের মধ্যে সংযোগের ব্যাপারটা আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আজকের দিনেও কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ককে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলার কাজে হেব-এর অনুমান সূত্রকেই অন্যতম প্রাথমিক নিয়ম হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। পাঁচের দশকে ফ্র্যাঙ্ক রোজেনব্ল্যাট-এর গবেষণা থেকে তৈরি হল তথ্য জমিয়ে রাখা এবং তাকে সঠিকভাবে গুছিয়ে রাখার মডেল।[3]

তবে, ১৯৬০ এর দশকের শেষের দিকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক সম্পর্কে উৎসাহে কিছুটা ভাটা পড়ে। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকে এই বিষয়ে আগ্রহ আবার বাড়তে শুরু করে। ঠিক এই সময়েই, পদার্থবিদ্যার মৌলিক ধারণা ও কর্মপদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে নিউরাল নেটওয়ার্কের কাঠামোর মধ্যে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের এক নতুন প্রযুক্তি গড়ে তুলতে শুরু করেছিলেন জন হপফিল্ড আর জিওফ্রে হিন্টন। তাদের সেই কাজের গুরুত্বকে অনুধাবন করেই ২০২৪ সালের পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে হপফিল্ড আর হিন্টনকে।

এবারে তাহলে হপফিল্ড আর হিন্টনের সেই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়টাকে সহজে বুঝে নেওয়ার একটা চেষ্টা করা যাক। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক আসলে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রকে অনুকরণ করার একটা চেষ্টা মাত্র। এখানে মস্তিষ্কের নিউরনগুলির অনুকরণে কিছু নোড ব্যবহার করা হয়; এই নোডগুলো বিভিন্ন মানের হতে পারে। আর সেই নোডগুলোর মধ্যে যে-সংযোগ সেগুলোই হল সাইন্যাপ্স-এর প্রতিলিপি; এই সংযোগগুলো খুব জোরালো হতে পারে, আবার দুর্বলও হতে পারে। তবে হপফিল্ডকে যে বিষয়টা সব থেকে বেশি

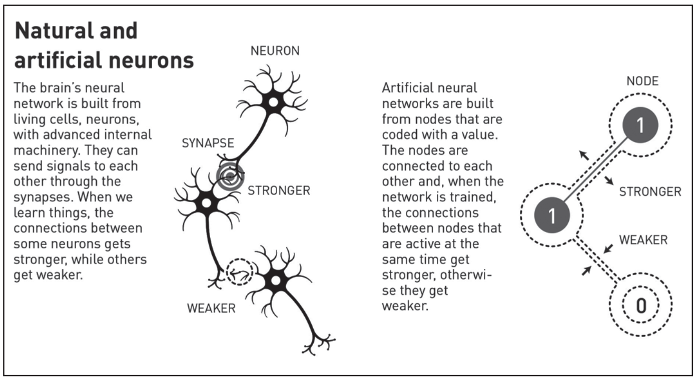


চিত্র ১: প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম নিউরন

আকৃষ্ট করেছিল সেটা হল : বেশ কিছু নিউরন যখন একসাথে কাজ করে, তখন তারা নতুন ধরনের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্ম দিতে পারে; কিন্তু নেটওয়ার্কের উপাদানগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝা যায় না। কৃত্রিম নেটওয়ার্কের ছোট ছোট উপাদানগুলো একসাথে কাজ করলে কিভাবে নতুন ধরনের আকর্ষণীয় ঘটনার জন্ম দিতে পারে, হপফিল্ড সেই ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে পড়লেন। আর সেটা বুঝতে হলে যে পদার্থবিদ্যার শরণাপন্ন হতে হবে, সেটাও তিনি অনুধাবন করলেন।

চৌম্বক পদার্থ সম্পর্কে, বিশেষ করে তাদের পারমাণবিক স্পিন (যে-ধর্ম প্রত্যেকটা পরমাণুকে একটা চুম্বক বানিয়ে তোলে) বিষয়ে তার

পড়াশোনা হপফিল্ডকে দারুণ সাহায্য করেছিল। প্রত্যেকটা পরমাণুর স্পিন তার প্রতিবেশী পরমাণুকে প্রভাবিত করে, আর তার ফলে নির্দিষ্ট স্পিনের একটা অঞ্চল (ডোমেন) গড়ে ওঠে। স্পিন-এর এই পারস্পরিক প্রভাবের ফলে পদার্থের নানান ধর্ম বিকশিত হয়ে ওঠার যে-ব্যাখ্যা পদার্থবিদ্যা থেকে পাওয়া যায়, হপফিল্ড তার সাহায্য নিয়েই নোড আর সংযোগের সমন্বয়ে তৈরি করে ফেললেন একটি মডেল নেটওয়ার্ক।

এবারে দেখার চেষ্টা করি কি ছিল সেই মডেলে ধরা যাক, খুব কম ব্যবহার করা হয় এমন একটা শব্দ আপনি মনে রাখার চেষ্টা করছেন। সেক্ষেত্রে আপনি স্মৃতি হাতড়িয়ে তার কাছাকাছি দু-তিনটে শব্দ মনে করার চেষ্টা করবেন। মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, কাছাকাছি শব্দের সাহায্য নিয়ে সঠিক শব্দটাকে খুঁজে বের করার এই প্রক্রিয়ার নাম হল সহযোগী স্মৃতি (associative memory)। ১৯৮২ সালে এটাকেই কাজে লাগালেন হপফিল্ড। তৈরি হল হপফিল্ড[4] নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্ক একদিকে যেমন বিভিন্ন নকশা বা প্যাটার্ন সংরক্ষণ করে রাখতে পারে, আবার প্রয়োজনে তাদের পুনর্গঠন করতেও পারে। একটা অসম্পূর্ণ বা কিছুটা বিকৃত কোনও নকশা এই নেটওয়ার্ককে দেওয়া হলে সে তখন জমিয়ে রাখা নকশাগুলোর মধ্যে থেকে যেটা সবচেয়ে কাছাকাছি সেই নকশাটাকে খুঁজে বের করে আনতে পারে।

হপফিল্ড যে-নেটওয়ার্ক তৈরি করলেন সেখানে সমস্ত নোড বিভিন্ন সংযোগ-এর মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত; এই সংযোগগুলোর কোনটা খুব শক্তিশালী, আবার কোনটা খুবই দুর্বল। প্রতিটি নোডের নির্দিষ্ট একটি মান হতে পারে— শুরুতে হপফিল্ড যে-নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন সেখানে প্রতিটি নোডের মান হিসেবে ০ বা ১ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল; অনেকটা সাদা-কালো ছবির পিক্সেলের মতো।

পদার্থবিদ্যায় কোনও স্পিন-যুক্ত বস্তুর শক্তি বলতে আমরা যা বুঝি তার সমতুল্য একটা বৈশিষ্ট্যকে হপফিল্ড নেটওয়ার্কের সামগ্রিক অবস্থাটাকে বোঝানোর কাজে লাগালেন। সমস্ত নোডের মান এবং প্রতিটা সংযোগ কতটা জোরালো— সেই তথ্য ব্যবহার করে একটা সূত্র তৈরি করা হল, যার সাহায্যে নেটওয়ার্কের মোট শক্তি হিসেব করা যায়। এবারে নোডগুলোতে একটা ছবি পাঠিয়ে নেটওয়ার্ককে তৈরি করে নেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা হল; আর ঐ নোডগুলো ০ (কালো) বা ১ (সাদা) হিসেবে চিহ্নিত হল। এবারে শক্তির ঐ সূত্র ব্যবহার করে নেটওয়ার্কের সংযোগগুলিকে এমনভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে নেওয়া হয় যাতে ঐ সংরক্ষণ করা ছবিটি সবথেকে কম শক্তি পায়।

এই অবস্থায় ঐ নেটওয়ার্কে অন্য কোনও ছবি বা প্যাটার্ন পাঠাতে হলে, প্রত্যেকটা নোডের মান পালটালে নেটওয়ার্কের মোট শক্তি কমে যাচ্ছে কি না সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যদি দেখা যায় যে একটা কালো পিক্সেল-এর বদলে একটা সাদা পিক্সেল আনলে নেটওয়ার্কের শক্তি কমে যাচ্ছে, তাহলে সাদা পিক্সেলকেই নেওয়া হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এভাবে ধাপে ধাপে উন্নতি করা সম্ভব, ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটা চলতেই থাকবে। নেটওয়ার্ক যখন এই অবস্থায় পৌঁছে যাবে যে আর কোনও পরিবর্তন করা সম্ভব হচ্ছে না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সে তখন যে ছবিটি দিয়ে তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল সেই ছবিটি আবার তৈরি করে দিতে পারে। শুধু তাই নয়। এভাবে যদি আমরা বেশ কিছু ছবি সংরক্ষণ করে রাখতে পারি, হপফিল্ড-এর নেটওয়ার্ক তাদের আলাদা করে চিনতেও পারে।

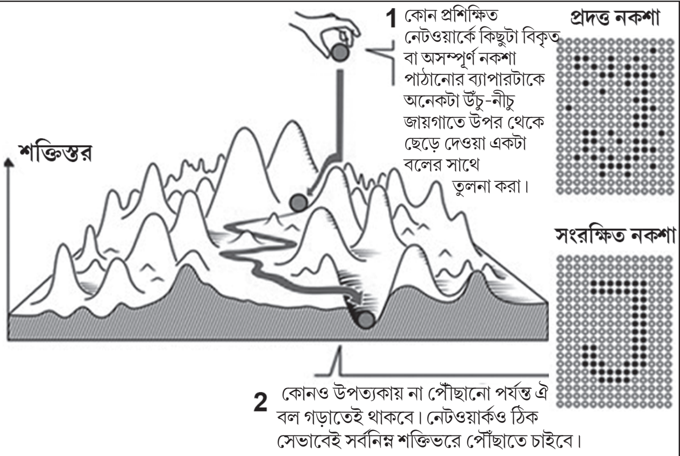


চিত্র ২: স্মৃতি সংরক্ষণ

*নেটওয়ার্ক ঘেঁটে একটা জমিয়ে রাখা ছবির সাথে নতুন ছবিকে মেলানোর ব্যাপারটাকে হপফিল্ড খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ধরা যাক, উঁচু-নীচু একটা জমিতে একটা বলকে গড়িয়ে দেওয়া হল। যেখান থেকে তাকে ছাড়া হল তার সবথেকে কাছের যে নীচু জায়গা, সেখানে গিয়ে সে থামবে। জমিয়ে রাখা কোনও ছবির খুব কাছাকাছি একটা ছবি যদি ঐ নেটওয়ার্কে দেওয়া হয়, সেও একইভাবে সবথেকে নীচু জায়গায়, মানে যেখানে শক্তি সবচেয়ে কম, সেখানে এসে থামবে। যে-তথ্যে বেশ কিছুটা ভেজাল মিশে আছে বা যে-তথ্যের বেশ কিছুটা অংশ মুছে ফেলা হয়েছে, সেরকম তথ্য পুনরুদ্ধার করার কাজেও হপফিল্ড নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা যেতে পারে।*

হপফিল্ড নেটওয়ার্ক-এর কাজকর্ম কিভাবে আরও উন্নত করা যেতে পারে বা ০ আর ১ ছাড়া অন্য কোনও মানও যাতে নোডগুলোতে দেওয়া যেতে পারে, সেই বিষয়ে হপফিল্ড ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছেন। আপনি যদি একটা নোডকে একটা পিক্সেল হিসাবে ভাবেন, তাহলে তার রঙ তো শুধু সাদা বা কালো হবে না, অন্য যেকোনো রঙই হতে পারে। পদ্ধতিগত উন্নতির ফলে এখন অনেক বেশি ছবি সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে, খুব কাছাকাছি হলেও তাদেরকে আলাদা করা যাচ্ছে।[5]

কিন্তু একটা ছবিকে মনে রাখা আর ঐ ছবি কী বলতে চাইছে সেটা ব্যাখ্যা করার মধ্যে অনেকটাই ফারাক আছে। খুব ছোট বাচ্চাও কুকুর, বিড়াল বা কাঠবিড়ালি আলাদা করে চিনতে পারে, খুব বেশি ভুল করে না। প্রাণিজগতের বিভিন্ন প্রজাতি বা স্তন্যপায়ী প্রাণী সম্পর্কে কোনো ধারণা ছাড়াই শিশু এটা শিখে নিতে পারে। বেশ কয়েকবার একটা প্রাণী দেখলেই শিশুর মস্তিষ্কে সেটা জায়গা করে নেয়। চারপাশের পরিবেশ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই আমরা একটা বিড়ালকে চিনতে পারি, অন্যের কথার অর্থ অনুধাবন করতে পারি বা পরিচিত ঘরে ঢুকে সেখানে কোনও অদলবদল করা হয়েছে কি না সেটা বুঝে যেতে পারি।

কিন্তু মানুষ যেভাবে কোনও একটা প্যাটার্নকে চিনতে বা বুঝতে শেখে, প্রয়োজনীয় তথ্য বেছে নিয়ে সেগুলো বিশ্লেষণ করে কম্পিউটার কি সেভাবে শিখতে পারে? আশির দশকে এই ব্যাপারটাকে নিয়েই চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন জিওফ্রে হিন্টন। হপফিল্ড নেটওয়ার্ককে আরও প্রসারিত করে নতুন একটা জায়গায় পৌঁছনোর লক্ষ্যে হিন্টনও এবারে সাহায্য নিলেন সেই পদার্থবিদ্যার। সহকর্মী টেরেন্স সেজনোস্কিকে ও ডেভিড অ্যাকলেকে সাথে নিয়ে হিন্টন স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সের ধ্যানধারণা কাজে লাগাতে শুরু করলেন কম্পিউটারকে প্রশিক্ষিত করার তাগিদে।

গ্যাস অণুর মতো একই ধরনের একগুচ্ছ কণার সমন্বয়ে তৈরি কোনও

সিস্টেমের আচার-আচরণ ব্যাখ্যা করতে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সকে কাজে লাগাই। গ্যাসের প্রত্যেকটা অণুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা বেশ কঠিন, কার্যত অসম্ভব; অথচ, তাদের সম্মিলিত গতিবিধির পর্যবেক্ষণ থেকে চাপ বা উষ্ণতার মতো বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা হিসেব করে ফেলতে পারি। গ্যাস অণুগুলো এক-একজন এক-একরকম বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে চাইলেও তারা নির্দিষ্ট একটা সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্যেই উপনীত হয়।

গ্যাস অণুর যে স্টেটগুলোতে সমষ্টির বিভিন্ন উপাদান যৌথভাবে থাকতে পারে, স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স ব্যবহার করে সেই স্টেটগুলোকে বিশ্লেষণ করা এবং তাদের সম্ভাবনা হিসেব করা যায়। উনিশ শতকের পদার্থবিদ লাডউইগ বোল্টজম্যান-এর তৈরি সমীকরণ থেকে খুব স্পষ্টভাবেই দেখানো যায় যে, এই সম্ভাবনা কত হবে সেটা নির্ভর করে স্টেটের শক্তির পরিমাণের উপর। এই সমীকরণ ব্যবহার করেই ১৯৮৫ সালে হিন্টন মেশিন লার্নিং-এর প্রক্রিয়াটাকে প্রকাশ করলেন বোল্টজম্যান মেশিন নামে।[6]

বোল্টজম্যান মেশিনে সাধারণত দুটো আলাদা ধরনের নোড ব্যবহার করা হয়। এক ধরনের নোডে তথ্য সরবরাহ করা হয়, এদেরকে বলা হয় দৃশ্যমান নোড। অন্য নোডগুলো মিলে গোপন একটা স্তর গঠন করে। এই গোপন নোডগুলোর মান আর সংযোগও সামগ্রিকভাবে নেটওয়ার্ককে শক্তি জোগায়।

বোল্টজম্যান মেশিনকে এমনভাবে চালানো হয় যাতে সমস্ত নোডের মান একসাথে আপডেট করা যায়। এভাবে চলতে চলতে মেশিন এমন একটা অবস্থায় আসে যে সেখানে নোডের প্যাটার্ন পাল্টালেও সামগ্রিকভাবে নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্য একই রকমের থাকে। সেই অবস্থায় প্রত্যেকটা সম্ভাব্য প্যাটার্নের নির্দিষ্ট একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়; আর বোল্টজম্যানের সমীকরণ অনুসরন করে নেটওয়ার্কের শক্তি ঠিক করে দেয় এই সম্ভাবনার মান কত হবে। এভাবে সম্পূর্ণ নতুন একটা প্যাটার্ন তৈরি করে তবেই মেশিন তার কাজ বন্ধ করে।

বোল্টজম্যান মেশিন শিখতেও পারে; শুধুমাত্র তাকে যে-নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তা থেকে নয়, তাকে যেসব উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে তা থেকেও সে শিখে নিতে পারে। নেটওয়ার্কের বিভিন্ন সংযোগের নোডগুলোর মান পাল্টিয়ে পাল্টিয়ে তাকে শেখানো হয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় দৃশ্যমান নোডগুলোতে যে উদাহরণ সরবরাহ করা হয়েছিল, মেশিন চালানোর সময় সেগুলোর ফিরে ফিরে আসার সম্ভাবনা কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন একই প্যাটার্ন যদি বেশ কয়েকবার ফিরে আসে, তাহলেই ঐ প্যাটার্নের সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশি বলে ধরা হয়। ঐ উদাহরণগুলোর কাছাকাছি কোনও প্যাটার্ন দেওয়া হলে তাকে পুনর্গঠন করার সম্ভাবনাও এই প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে বাড়ানো যায়।

একটা প্রশিক্ষিত বোল্টজম্যান মেশিন অচেনা তথ্য থেকেও পরিচিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিনে নিতে পারে। ঠিক যেমন আপনার বন্ধুর সহোদর কোনও ভাই বা বোনকে দেখেই আপনি তার সাথে আপনার বন্ধুর সম্পর্কের একটা ধারণা তৈরি করে ফেলতে পারেন। একইভাবে, প্রশিক্ষণের সময়ে সে যে-উদাহরণগুলো দেখেছিল তার সাথে কোনও একটা সম্পর্ক যদি থেকে যায়, তাহলে বোল্টজম্যান মেশিন সম্পূর্ণ নতুন একটা উদাহরণও চিনে নিতে পারে; আর যেগুলো ঠিক সেরকম নয়, তাদেরকে আলাদা করতেও পারে।

২০০৬ সালে হিন্টন তার সহকর্মী সাইমন ওসিন্ডারো, ইয়ে হোয়াই তেহকে সাথে নিয়ে স্তরে স্তরে, একটার উপর আরেকটা এভাবে, বেশ কিছু বোল্টজম্যান মেশিন রেখে নেটওয়ার্ক-এর প্রাক-প্রশিক্ষণের একটা পদ্ধতি তৈরি করলেন।[7] ছবির বিভিন্ন উপাদানকে চিনে নেওয়ার জন্য নেটওয়ার্ককে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কার্যকরী তোলার ক্ষেত্রে এই প্রাক-প্রশিক্ষণ নেটওয়ার্কের সংযোগগুলোকে আরও সক্রিয় করে তোলে। বর্তমানে অনেকগুলো স্তরে বিশাল মাপের কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক তৈরি করা হচ্ছে যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক, আর যেভাবে এদের প্রশিক্ষিত করে তোলা হয় তাকে বলা হয় ডিপ লার্নিং। ১৯৮০-এর দশক থেকে জন হপফিল্ড এবং জিওফ্রে হিন্টন যে কাজ শুরু করেছিলেন, সেই শক্ত মাটিতেই মেশিন লার্নিং বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপনের কাজ শুরু হয় ২০১০ সাল নাগাদ।

পদার্থবিদ্যা তার সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করে মেশিন লার্নিং-এর বিকাশে যেমন সাহায্য করেছে, ঠিক সেরকমই পদার্থবিদ্যার বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণার কাজে মেশিন লার্নিং-এর ব্যবহার হয়ে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হিগস কণা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ তথ্য অনুসন্ধান এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য মেশিন লার্নিং-এর ব্যবহার। ব্ল্যাক হোলের সংঘর্ষে উৎপন্ন মহাকর্ষীয় তরঙ্গের মাপজোকের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত সিগন্যালের প্রভাবকে কমিয়ে আনা বা সৌরজগতের বাইরের গ্রহ খুঁজে বের করার কাজেও মেশিন লার্নিং-এর ব্যবহার সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সাম্প্রতিককালে, প্রোটিন অণুর কার্যকারিতা কিভাবে নির্ধারিত হয় বা তাদের গঠনসংক্রান্ত হিসেব-নিকেশ করতে অথবা পদার্থের কোন নতুন সংস্করণ সৌর কোষে ব্যবহারের সেরা দাবিদার হতে পারে তার ভবিষ্যদ্বাণী করার কাজেও এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে।

এখন কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক বিজ্ঞান গবেষণাকে কতখানি সাহায্য করতে পারে সেটা দেখার জন্যই আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। তবে এই প্রযুক্তির বিকাশ এবং তার ব্যবহারের নৈতিকতা নিয়ে যে বিস্তারিত আলোচনা চলছে, সেটা ভুললে চলবে না।

**তথ্যসূত্র :**


1. W. S. McCulloch & W. Pitts, A Logical Calculus of the ideas immanent in Nervous Activity, Bulletin of Mathematical Biophysics, Volume 5, 1943.
2. D. O. Hebb, The organization of behaviour, Wiley & Sons, New York, 1949.
3. F. Rosenblatt, The Perceptron : A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the brain, Psychological Review, Vol. 65 No. 6, 1958.
4. J. J. Hopfield, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 79, 2554, 1982.
5. D. J. Amit, H. Gutfreund & H. Sompolinsky, Phys. Rev. A 32, 1007, 1985.
6. D. H. Ackley, G. E. Hinton and T. J. Sejnowski, Cogn. Sci. 9, 147, 1985.
7. G. E. Hinton, S. Osindero & Y. W. Teh, Neural Comput. 18, 1527, 2006.


---


**লেখক বিজ্ঞানের শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক**

*e-mail: anindya05@gmail.com • M. 9432220412*

প্রচ্ছদ কথা ৪ নোবেল : শান্তি পুরস্কার

ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

# পারমাণবিক অস্ত্র-বিরোধী আন্দোলন ও আমরা

'সা রে গা মা পা ধা নি, বোম ফেলেছে জাপানি' — ১৯৪০-এর দশকে এই ধরনের ছড়া বাংলায় শোনা যেত। এর প্রমাণ মেলে বাংলা সাহিত্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমের আতঙ্ক ছিল কলকাতা শহরজুড়ে। কলকাতা থেকে দলে দলে মানুষ ছুটতে শুরু করেছিল সদর-মফঃস্বলে। তবে বাস্তবে ব্যাপারটা হল উল্টো। কলকাতায় জাপানের বোমা পড়ল না। আমেরিকা বোমা ফেলল জাপানের দুটো শহরে। ১৯৪৫ এর ৬ এবং ৯ আগস্ট হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে আণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল তা সারা পৃথিবীতেই নাড়া দিয়েছিল। সেই বোমা আগেকার বোমাগুলো থেকে ছিল চরিত্রগতভাবে আলাদা। বোমা বিস্ফোরণে কিছু মানুষ মারা যায় কিন্তু পারমাণবিক বোমা ছাপ রেখে যায় পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও। বংশানুক্রমিকভাবে বিকৃতির কারণ ঘটায় এই বোমা। আর এর তেজস্ক্রিয় দূষণ কোনও দেশ-কালের সীমারেখা মানে না। হিরোশিমা নাগাসাকিতে যে ধ্বংসলীলা ঘটে গেল সারা বিশ্ববাসীকে তা সচকিত করে দিল। পাঁচ বছর পরে রাজশেখর বসু তাঁর 'বিজ্ঞানের বিভীষিকা' (১৯৫০) প্রবন্ধে লিখলেন, 'পরমাণু বোমা আবিষ্কারের পূর্বে যুদ্ধ এত ভয়াবহ ছিল না।' সত্যিই তাই। পরমাণু অস্ত্র যে কতটা ভয়াবহ তা তাঁরা আরও বেশি করে অনুভব করলেন যাঁরা পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার শিকার হলেন। হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে আক্রান্ত মানুষ, যাঁরা কোনওভাবে প্রাণে বেঁচেছেন তাঁরা নিজেদের করুণ অভিজ্ঞতার কথা সকলকে জানাতে সচেষ্ট হলেন। তাঁদের বলা হয় হিবাকুশা। এই হিবাকুশারাই গড়ে তুললেন সংগঠন। সংগঠনের নাম নিহন হিদানকায়ো। যাতে আর কখনও পৃথিবীতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে না আসে সেই কাজেই নিয়োজিত এই সংগঠন। নিহন হিদানকায়ো সারা পৃথিবীতেই পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করল। এই সংগঠনই এ-বছর ২০২৪এ নোবেল শান্তি পুরস্কারে সম্মানিত হল। নোবেল কমিটি তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'পৃথিবীকে পরমাণু অস্ত্র মুক্ত করতে নিহন হিদানকায়োর যে ভূমিকা, তাকে কুর্নিশ জানাচ্ছি আমরা।'

১৯৫৬ সালে গড়ে উঠেছিল **'নিহন হিদানকায়ো'** নামের এই সংগঠনটি। এদের বড় কাজ ছিল পারমাণবিক শক্তির ভয়াবহতাকে তুলে ধরা আর সেই কাজটা তারা করেছিল প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান নথিভুক্ত করে। হিবাকুশাদের এই সংগঠন পারমাণবিক অস্ত্রের ধ্বংসাত্মক দিক সম্পর্কে সারা পৃথিবীতেই সচেতন করে তুলেছিল। নোবেল কমিটি মন্তব্য করেছে, ১৯৪৫এর পর আশি বছরে যে কোনও পারমাণবিক অস্ত্র, যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়নি তা পারমাণবিক অস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের সাফল্যকেই প্রমাণ করে। নিহন হিদানকায়ো নিঃসন্দেহে এই আন্দোলনের অগ্রণী সংস্থা। তবে মনে রাখতে হবে এই কাজে তার পাশে ছিল দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন। এর মধ্যে রয়েছে শান্তিকামী অহিংস সংগঠন, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা এবং অবশ্যই বিজ্ঞান ও পরিবেশ নিয়ে কাজ করে এমন অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পারমাণবিক শক্তি এবং অস্ত্র বিরোধিতার এক দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। গান্ধীবাদী অহিংস মানুষ যেমন এর বিরোধিতা করেছেন, তেমনই বিরোধিতা এসেছে বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের পক্ষ থেকে। ১৯৮২-র ৬ আগস্ট পারমাণবিক অস্ত্র বিরোধী মিছিল হয়েছিল কলকাতায়। সেই মিছিলে ছিল প্রবীণ বিজ্ঞান সংগঠন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ছিল উৎস মানুষ পত্রিকা, কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার-এর মত সংস্থা। এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে সেই মিছিল থেকেই দানা বাঁধে এ-রাজ্যের বিজ্ঞান আন্দোলন। পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে শুধু পারমাণবিক অস্ত্র এবং শক্তি বিরোধিতার সংগঠন অ্যান্টি নিউক্লিয়ার ফোরাম (১৯৮৫)। পত্রিকা-পুস্তিকা-আলোচনা-সভা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে চলতে থাকে পারমাণবিক অস্ত্র ও শক্তির বিরোধিতা। এই কাজে সুজয় বসু, শ্যামলী খাস্তগীর, বাদল সরকার, প্রদীপ দত্ত (পকাই)-এর মত কয়েকজন অগ্রণী সৈনিকের কথা বলতেই হবে। আশির দশক জুড়ে এবং নব্বই দশকের গোড়ার দিকে এই আন্দোলনের সক্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো। পরে এই আন্দোলন কিছুটা থিতিয়ে পড়লেও তা নতুন করে জোরদার হয়ে ওঠে ১৯৯৮-এর ১১ মে পোখরানে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর। সেই সময় দেশজোড়া যে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন এ-রাজ্যের বিজ্ঞানকর্মীরা। সে-বছর ৬ আগস্ট প্রতিবাদী পদযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন কলকাতা শহরসহ সারা রাজ্যের সচেতন শান্তিকামী মানুষ।

এই সচেতন সক্রিয় প্রতিরোধের জন্যই এরাজ্যে বাববার (১৯৮৪, ১৯৯২, ২০০০ এবং ২০০৬-এ) পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব উঠলেও সেই পরিকল্পনা শেষ অবধি বাস্তবায়িত করা যায়নি। এই আপত্তির কারণ বাদল সরকারের লেখার একটি বাক্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে; তাঁর ভাষায়, পরমাণু বিদ্যুৎ পরিচ্ছন্ন, সস্তা ও নিরাপদ— এই তিনটে কথাই ধাপ্পা এবং একেবারে মিথ্যে! ফলে নিহন হিদানকায়োর নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্তি আসলে সারা পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের পুরস্কারপ্রাপ্তি। এরাজ্যের পরমাণু অস্ত্র এবং শক্তিবিরোধী আন্দোলনের সেনানীরাও এই পুরস্কারকে তাদের নিজেদের পুরস্কার বলে মনে করতে পারেন। আত্মতুষ্টি নয় বরং এক আশাবাদ আমাদের আগামীর কাজে পাথেয় হবে। সেই আশা হল পারমাণবিক অস্ত্র থেকে দূরে থাকবে আমাদের পৃথিবী। নোবেল শান্তি পুরস্কার শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেবে সারা বিশ্বে।

**লেখক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক**

e.mail: sabya4@gmail.com M.9433353349

অর্কজিৎ সেন

# ২০২৪ সালের অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার

অর্থনীতি বিষয়ক একটি বই রয়েছে। যার নাম 'হোয়াই নেশন্স ফেল দা অরিজিন অফ পাওয়ার, প্রসপারিটি, অ্যান্ড পভার্টি'। দুইজন মিলে এই বইটি লিখেছেন। ম্যাসাচুসেট ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-র অর্থশাস্ত্রের দুই অধ্যাপক ড্যারন অ্যাসেমোগলু ও জেমস রবিনসন। ২০২৪ সালে অর্থনীতি বিষয়ে নোবেল প্রাপক-এর সংখ্যা তিন। যৌথভাবে মনোনীত হয়েছেন তুরস্ক বংশোদ্ভূত ড্যারন অ্যাসেমোগলু (Daron Acemoglu), ইংল্যান্ডের সাইমন জনসন (Simon Johnson) এবং আমেরিকার জেমস এ রবিনসন (James A. Robinson)। পূর্বে উল্লেখিত ২ লেখকের সঙ্গে আরেকজন। এই তিনজন গবেষকই বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক। এনাদের গবেষণার বিষয় হল দেশীয় সমৃদ্ধিতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা। ড্যারন ও সাইমন ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি)-তে গবেষণারত আর জেমস শিকাগো ইউনিভার্সিটির গবেষক। নোবেল কমিটি জানিয়েছে, কোন দেশের আর্থিক উন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঠিক কেমন ভূমিকা পালন করে এই বিষয় নিয়ে নোবেল পুরস্কার জয়ী এই তিন অর্থনীতিবিদ গবেষণা করেছেন। এর মাধ্যমে যে সমস্ত নতুন চমকপ্রদ তথ্য সামনে এসেছে, তা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিশা প্রদর্শনে সহায়ক হবে। তাঁরা দেখিয়েছেন, শক্তিশালী ও সার্বিক অংশীদারিত্ব ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আর্থিক প্রগতি ও সমৃদ্ধির দিকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, যে দেশগুলিতে আইনের শাসন দুর্বল ও প্রতিষ্ঠানগুলির চরিত্র শোষণমূলক, সেইসব দেশ আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হতে পারে না। তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে আরও বোঝা যায় যে, কোনও দেশ কেন সাফল্য লাভ করেছে এবং কোনও দেশ কেন ব্যর্থ হয়েছে।

অর্থনীতিতে পুরস্কার কমিটির চেয়ারপার্সন জ্যাকব সোয়েনশন জানিয়েছেন, বিভিন্ন দেশের মধ্যে আয়ের যে বিপুল বৈষম্য রয়েছে তার হ্রাস বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর সেই লক্ষ্য পূরণে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এই তিন অর্থনীতিবিদ। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি কীভাবে গড়ে উঠেছে এবং পরিবর্তিত হয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন পুরস্কার বিজয়ীরা। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল সম্পদ বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কার হাতে রয়েছে? মুষ্টিমেয় শাসক শ্রেণি, না সাধারণ মানুষ? তাঁরা দেখিয়েছেন, জনগণের হাতে যদি ক্ষমতা তুলে দেওয়া যায় তাহলে তা সেই দেশের আর্থিক অগ্রগতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

এই তিনজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের গবেষণায় উঠে এসেছে ইতিহাসের প্রসঙ্গ। তিন অধ্যাপকের যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণে বিশ্লেষিত হয়েছে, উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার আগে সেই ঔপনিবেশিক দেশগুলি আর্থিকভাবে কতটা সচ্ছল ছিল এবং এখন বা বলা যায় স্বাধীন হওয়ার পরে সেই দেশগুলি কীভাবে বৈশ্বিক দারিদ্রের কেন্দ্র হয়ে উঠল। এর কারণও নাকি লুকিয়ে রয়েছে ঔপনিবেশিক আমলের প্রতিষ্ঠানের নীতিতে। এমনটাই বলেছেন— এই তিন নোবেলজয়ী। তাঁদের মতে, উপনিবেশ-গুলিতে যে ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল, তাকে দুটি গোত্রে ভাগ করা যায়— একটি ছিল লুণ্ঠনমুখী অর্থাৎ উপনিবেশের সম্পদ লুট করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য, অন্যটি ছিল গঠনমুখী; ঔপনিবেশিকরা যেখানে প্রতিনিধিত্বমূলক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে দেশগুলি স্বাধীন হয়েছে সেগুলির অবস্থা বর্তমানে অনেকটাই স্বচ্ছল। কিন্তু প্রথম গোত্রের দেশগুলি এখনো দারিদ্রতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। যদিও বিশ্বের প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে এমনটা নয়।

পূর্বে মার্কিন বিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিক জারেদ ডায়মন্ড ও মার্কিন অর্থনীতিবিদ জেফ্রি স্যাক্স বিভিন্ন দেশে সমৃদ্ধির পার্থক্যকে ভৌগোলিক পরিস্থিতির তারতম্য দিয়ে ব্যাখ্যা করার একটা প্রচেষ্টা করেছেন। কিছু বছর আগে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার জয়ী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও এস্থার ডাফলো দেখিয়েছিলেন যে সমাজের তথাকথিত 'এলিট' শ্রেণি বা উচ্চবর্গ শ্রেণির 'অজ্ঞতাই' আয়ের বৈষম্যের জন্য দায়ী। সেমর মার্টিন লিপসেট দিয়েছেন 'মডার্নাইজেশন' তত্ত্ব। এসবের বিপ্রতীপে অ্যাসেমোগ্লু, রবিনসন আর জনসন এই তিনজন বলছেন যে, মানুষের তৈরি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান-ই নাকি দায়ী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা সমৃদ্ধিহীনতার জন্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং শান্তিতে নোবেল ১৯০১ সাল থেকে চালু হয়। অর্থনীতি বিষয়টি তালিকাভুক্ত হয় অনেক পরে ১৯৬৮ সালে। অর্থনীতিতেও অ্যালফ্রেড নোবেলের স্মৃতিতে পুরস্কার দেওয়া হয়। সুইডেনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক-এর তহবিল থেকে যার ফান্ডিং আসে। এই তিন নোবেল পুরস্কার জয়ীই নোবেল পদক পাবেন, একটি সনদপত্র এবং মোট ১১ বিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনা (ভারতীয় মুদ্রায় যার মূল্য আট কোটি ৯০ লক্ষ টাকারও বেশি) সহ।

**তথ্যসূত্র**

https://www.anandabazar.com/science/3-economists-daron-acemoglu-simon-johnson-and-james-a-robinson-get-2024-nobel-prize-for-economics-dgtl/cid/1552922

সংবাদ প্রতিদিন, ২০.১০.২০২৪

**লেখক বিজ্ঞানকর্মী ও বিজ্ঞান লেখক**

*E-mail : senarkjit557@gmail.com*

পরিবেশ

রা হু ল রা য়

# মাইক্রোপ্লাস্টিকে বিপন্ন পরিবেশ-বন্ধু নীল তিমি সহ অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী

*শুনে তো পুরো থ! নেচার কমিউনিকেশন্স-এর এক সমীক্ষা (২০২২) জানাচ্ছে, একটি নীল তিমি রোজ প্রায় এক কোটি মাইক্রোপ্লাস্টিক (আকারে পাঁচ মিলিমিটার বা কম) খায়, যার ওজন প্রায় ৪৩.৬ কিলোগ্রাম। পিঠে কুঁজওলা তিমি, যারা মূলত মাছ খায়, তুলনায় প্রায় ৫০ গুণ কম মাইক্রোপ্লাস্টিক (রোজ দু-লক্ষ) খায়। আবার এই প্রজাতির ক্রিল-খাওয়া (প্রাণী-প্লাঙ্কটন) তিমির পেটে রোজ প্রায় ৪ লক্ষ মাইক্রোপ্লাস্টিক যায়। এর আগেও অকল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ক্ষেত্রসমীক্ষা (নভেম্বর, ২০২১) করে দেখেছিলেন, নিউজিল্যান্ডের হাউরাকি উপসাগরের তিমিরা রোজ প্রায় ৩০ লক্ষ মাইক্রোপ্লাস্টিক খায়।*

## গবেষকরা কী দেখলেন

অকল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রসমীক্ষার লেখক লরা জানটিস জানাচ্ছেন, তিমিরা যে পরিবেশে থেকে শিকার ধরে খায়, ক্রমাগত তার নমুনা রেখে যায়। তিমিরা রোজ কী পরিমাণ মাইক্রোপ্লাস্টিক খাচ্ছে এবং এগুলি তাদের খাদ্যের মাধ্যমেই, নাকি খাবার সময় যে সমুদ্র জল খায়, তার মধ্য দিয়ে শরীরে যাচ্ছে, এটা জানাই ছিল গবেষকদের উদ্দেশ্য। এখানে গড়ে প্রতিটি তিমির এক চা-চামচ মলে পাঁচটি মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। এটিই বোঝাচ্ছে, তিমির খাদ্যশৃঙ্খলে মাইক্রোপ্লাস্টিক জায়গা নিয়েছে।

তিমির ডিএনএ পরীক্ষা করে গবেষকরা দেখেছেন, এরা মূলত ক্রিল জাতীয় ছোট প্রাণী-প্লাঙ্কটন খায়। ডিএনএ কী? পুরো কথাটি হল ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড, এটি জীবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের জিনগত নির্দেশ ধারন করে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, প্রতিটি ঢোঁক বা গ্রাসে প্রায় ৮০,০০০ লিটার অব্দি জলের সাথে যত ক্রিল ও ছোট মাছ তিমি খায়, তাতে প্রায় ২৫,০০০ মাইক্রোপ্লাস্টিক থাকে। বেশিরভাগ মাইক্রোপ্লাস্টিকই পাওয়া গেছে তাদের খাওয়া শিকার থেকে। প্রতি হাজার মাইক্রোপ্লাস্টিকের মধ্যে মাত্র একটি তাদের শরীরে যায় খাবার সময় সমুদ্র জলের মাধ্যমে। দিনে বেশ কয়েকবার খাবার সময় যে বিপুল পরিমাণ মাইক্রোপ্লাস্টিক তিমির শরীরে ঢুকছে, তা তাদের পক্ষে চরম বিপজ্জনক।

## তিমি যেভাবে পরিবেশ রক্ষা করে

সমুদ্র মনুষ্যকৃত কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গমনের প্রায় ৩০% শোষণ করে। সমুদ্রজলে ভাসমান উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটন সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে কার্বনডাইঅক্সাইড শোষণ করে তাকে জৈব-বস্তুতে (পরিপোষক) রূপান্তরিত করে। এই কার্বন তখন খাদ্যশৃংখলে ঢুকে কোন জীবন্ত প্রাণীদেহে জমা হয়, নয়তো সামুদ্রিক প্রাণীর মল বা মৃতদেহে জমা হয়ে সমুদ্র-তলদেশে থাকে। উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটনের বৃদ্ধির জন্য সমুদ্র-তলদেশে থাকা এই পরিপোষকের প্রয়োজন। কিন্তু উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটন থাকে সমুদ্রজলের উপরিভাগে, কারণ সালোকসংশ্লেষের জন্য এর সূর্যালোক প্রয়োজন। তাহলে উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটন তার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি কীভাবে পায়? তিমিরা জোগায়।

## কীভাবে?

তিমি সমুদ্রের অনেক গভীরে খাদ্যসংগ্রহ করতে পারলেও শ্বাসক্রিয়া চালানোর জন্য তাকে সমুদ্রজলের উপরিভাগে উঠতেই হয়। তার এই উল্লম্বভাবে ওঠানামার সময় সমুদ্রতলদেশে জমা পরিপোষক সমুদ্রের উপরিতলে চলে আসে। সমুদ্রতলদেশে চাপ বেশি থাকায় তিমিরা একমাত্র সমুদ্রের উপরিভাগেই মলত্যাগ করতে পারে। যত বড় তিমি, তত বেশি তার মলের পরিমাণ। এই মলে লোহা এবং নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে থাকে যা উদ্ভিদ-প্লাংকটনের যথার্থ পরিপোষক বা সার। তিমিরা যেহেতু দূরদূরান্তে ভেসে বেড়ায়, তাই উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটনের এই পরিপোষক এক বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে সমুদ্রজলের উপরিভাগে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সমুদ্রে তিমির সংখ্যা যত বেশি হবে, উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটনও তত বেশি হবে, ফলে কমবে বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ। কিন্তু আশঙ্কাজনকভাবে প্লাস্টিক দূষণে প্রতি বছর প্রায় এক লক্ষ সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীর মৃত্যু হয়।

কেবল জীবিত তিমিই নয়, মৃত তিমিও পরিবেশ রক্ষা করে। কীভাবে? তিমির আকৃতি বিশাল। একটি নীল তিমি লম্বায় প্রায় ৩০ মিটার। ওজন ১৫০ টন। এরা মারা গেলে মৃতদেহ কার্বন-সিঙ্ক হিসেবে গভীর সমুদ্র-তলদেশে পড়ে থাকে। একটি তিমির মৃতদেহ বছরে প্রায় ৩৩ টন কার্বনডাইঅক্সাইড ধরে রাখতে পারে, যেখানে একটি বড় গাছ পারে বছরে ২২ কিলোগ্রাম কার্বনডাইঅক্সাইড ধরে রাখতে। গভীর সমুদ্রের নানান প্রজাতিও তিমির মৃতদেহ থেকে পরিপোষক সংগ্রহ করে। তাই তিমির অবলুপ্তি হলে সমুদ্রের খাদ্যশৃংখলে এক বড়সড়ো ব্যাঘাত ঘটবে, কার্বন-সিঙ্ক নষ্ট হয়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট আরও ঘনীভূত হবে।

## আতঙ্কের নাম মাইক্রোপ্লাস্টিক

বর্তমানে প্লাস্টিক ও মাইক্রোপ্লাস্টিক প্রকৃতির সর্বত্র ছেয়ে গেছে। বর্তমান ভূতাত্ত্বিক যুগ অ্যানথ্রোপোসিন (পৃথিবীতে মানুষের তৈরি বিপর্যয়)-এর এরা ভগীরথ। নতুন এক সামুদ্রিক-জীবাণুঘটিত-বাসভূমি 'প্লাস্টিস্ফিয়ার' এদের নামেই উচ্চারিত। খাদ্যে, পানীয়ে এবং বাতাসে আজ মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি। প্রতিটি মানুষ বর্তমানে বছরে ৫০,০০০-এরও বেশি প্লাস্টিক-কণা খাদ্য-পানীয়ের মাধ্যমে শরীরে টেনে নিচ্ছে। শ্বাসগ্রহণের বিষয়টি ধরলে হিসেবটি আরও বাড়বে। পোড়া বা ফেলে দেওয়া একবার-ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক মানুষের স্বাস্থ্য ও জীববৈচিত্র্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। পাহাড়চূড়া থেকে গভীর সমুদ্রতল পর্যন্ত অঞ্চলকে এরা দূষিত করে।

ফল এবং শাকসবজিতেও মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। আপেল-এ মাইক্রোপ্লাস্টিকের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। ২০১৭ সালে বিজ্ঞানী স্যাম ম্যাশন

এবং ওর্বমিডিয়া-কৃত পাঁচটি মহাদেশের ১৫৯টি কলের জলের নমুনা পরীক্ষায় দেখা গেছে তার ৮৩ শতাংশেই মাইক্রোপ্লাস্টিক উপস্থিত। আর নয়টি দেশের ১৯টি অঞ্চল থেকে এগারো রকম ব্র্যান্ডের ২৫৯টি পানীয় জলের যেসব বোতল পরীক্ষা করা হয়েছিল, তার ৯৩ শতাংশে মাইক্রোপ্লাস্টিক (গড়ে প্রতি বোতলে ৬.৫ মাইক্রোমিটারের বড় ৩২৫টি) মিলেছে। ২০১৮ সালে ইণ্ডিয়ন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং গ্রিনপিস পূর্ব এশিয়া ছয়টি মহাদেশের ১৬টি দেশের ৩৯টি ব্রান্ডের সামুদ্রিক নুনের প্রতি কিলোগ্রামে ০-১৬৭৪ মাইক্রোপ্লাস্টিক-কণা পেয়েছে। এমনকি বেশ কিছু শিশুর দেহ পরীক্ষা করে প্রায় ৯৭ শতাংশেরই দেহতন্ত্রে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি দেখা গেছে।

## শুধু কি তিমি-ই বিপন্ন

মোটেই না। বর্তমানে প্লাস্টিক দূষণে সমুদ্র অত্যন্ত বিপন্ন। পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ৩০ কোটি টন প্লাস্টিক উৎপাদিত হয়। এই প্লাস্টিকের ৭৮ শতাংশের কোন পুনরাবর্তন হয় না। Beachapedia নামে এক সংস্থা জানাচ্ছে, সমুদ্রের মোট বর্জ্যের ৮০ শতাংশ প্লাস্টিক। প্রতি বছর প্রায় এক কোটি ১০ লক্ষ মেট্রিক টন প্লাস্টিক সমুদ্রে মিশছে। পরবর্তী কুড়ি বছরে এই পরিমাণটি বেড়ে প্রায় দু কোটি ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন হতে পারে। প্রায় ৭৩ শতাংশ গভীর-সমুদ্রের মাছের পেটে প্লাস্টিক পাওয়া গেছে। ৫০ শতাংশ সামুদ্রিক কচ্ছপের পাকস্থলিতে প্লাস্টিক মিলেছে। সামুদ্রিক কচ্ছপের বিভিন্ন প্রজাতি আজ অতি বিপন্ন। এদের সংখ্যা দিন দিন কমছে। প্লাস্টিক দূষণে, প্লাস্টিকের জালে আটকে এবং পাকস্থলিতে প্লাস্টিক চলে যাবার ফলে ৭০০ রকম সামুদ্রিক প্রাণী আজ বিলুপ্তির পথে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম-এর এক পর্যবেক্ষণে জানা গেছে, আগামী ২০২৫ সালে প্রতি তিন টন মাছে ১ টন প্লাস্টিক পাওয়া যাবে। ২০৫০ সালে সমুদ্রে মাছের থেকে প্লাস্টিক বেশি পাওয়া যাবে। ওই একই সময়ের মধ্যে সকল প্রজাতির সমুদ্র-পাখির পেটে প্লাস্টিক-বর্জ্য পাওয়া যাবে।

এখানে বলার, মাইক্রোপ্লাস্টিকের হাত থেকে মানবপ্রজাতিও নিরাপদ নয়। যেসব বিষাক্ত রাসায়নিক প্লাস্টিকে ব্যবহৃত হয়, সেগুলির পরিমাণও মানবশরীরে ক্রমাগত খাদ্যের মাধ্যমে বেড়ে চলেছে।

## প্লাস্টিকের বাড়বাড়ন্ত ও ক্রমবর্ধমান বর্জ্য

১৯৫০-১৯৭০ দশক পর্যন্ত প্লাস্টিকের উৎপাদন অল্প ছিল। ফলে তখন প্লাস্টিক বর্জ্য খুব একটা মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। ১৯৭০-১৯৯০ দশকে প্লাস্টিকের উৎপাদন ৩ গুণ বেড়েছে। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সমপরিমাণ বর্জ্য। 'স্টকহোম রেজিলিয়েন্স সেন্টার'-এর এক সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ২০০০-২০১৫ সালের মধ্যে পৃথিবীতে প্লাস্টিকের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৭৯ শতাংশ। ২০২২ সালে আগস্ট মাসের শেষের দিকে কোস্টারিকা-র 'ওসা কনজারভেশন'-এর সামুদ্রিক কচ্ছপ সংরক্ষণ দল সেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের নির্জন ওসা উপদ্বীপের উপকূলে প্লাস্টিক বর্জ্যের অতিবৃদ্ধি লক্ষ করেছিলেন। এসব বর্জ্যের বেশিরভাগটাই ছিল প্লাস্টিকের পানীয় জলের বোতল।

বর্তমানে এই গ্রহটিতে প্লাস্টিকের মোট ভর (mass) জীবন্ত সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর মোট ভরের দ্বিগুণ। ২০০০-দশকের গোড়ায় এই প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ আগের ৪০ বছরের পরিমাণকে এক দশকেই ছাপিয়ে গেল। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতি বছরে ৪০ কোটি টনের বেশি প্লাস্টিক উৎপাদিত হচ্ছে। পরিমাণটি ২০৪০ সালে দ্বিগুণ হবে বলে

ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনইপি) মনে করছে। পৃথিবীতে যে হারে প্লাস্টিক ব্যবহার বেড়েছে, তা চলতে থাকলে, ২০৫০ সালে প্রাথমিক প্লাস্টিকের উৎপাদন দাঁড়াবে প্রায় ১১০ কোটি টন। উল্লেখ্য, বিশ্বজুড়ে এপর্যন্ত যে ৭০০ কোটি টন প্লাস্টিক বর্জ্য সৃষ্টি হয়েছে, তার ১০ শতাংশেরও কম আবার ব্যবহারের উপযোগী (পুনরাবর্তন) হয়েছে। বাদ বাকি মিশছে পরিবেশে, বা কখনো জাহাজে করে এই বর্জ্য হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে কোন জায়গায় পোড়ানো হয় বা মাটিতে পোঁতা হয়।

## প্লাস্টিকের উৎপাদন ও ব্যবহার

বেশ কিছু প্রয়োজনীয় কাজে প্লাস্টিক ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে মানুষ একবার-ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক-এর জিনিসই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের দিক থেকে এর প্রভাব সুগভীর। ইউএনইপি জানাচ্ছে, পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে ১০ লক্ষ প্লাস্টিকের বোতল কেনা হয় এবং ৫ ট্রিলিয়ন প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। জে লোরেন্স, জে মেইজার প্রমুখ গবেষকরা জানাচ্ছেন, পৃথিবীতে ২০২১ সাল পর্যন্ত যত প্লাস্টিক তৈরি হয়েছে, তার ৬০ শতাংশ গেছে জমিভরাটের কাজে, বা এগুলি প্রকৃতিতে মিশেছে। পৃথিবীতে যত প্লাস্টিক তৈরি করা হয়, তার অর্ধেকটাই একবার ব্যবহারের জন্য। ব্যবহারের পর এগুলি ফেলে দেওয়া হয় ('থ্রো-অ্যাওয়ে' সংস্কৃতি), যার ৮৫ শতাংশ জমিভরাটে ব্যবহৃত হয়। বাকি পরিবেশে রয়ে যায় অনিয়ন্ত্রিত বর্জ্য হিসেবে। ভারতবর্ষে প্রতি বছর সৃষ্ট ৩৫ লক্ষ টন প্লাস্টিক বর্জ্যের ৬৮ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ২৪ লক্ষ টন একবার-ব্যবহারযোগ্য। 'মিন্ডারলু ফাউন্ডেশন' জানাচ্ছে, পৃথিবীতে একবার-ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পলিমার উৎপাদনে লগ্নিকারী হিসেবে ভারতের স্থান তেরো। ভারতে প্রতি বছর মাথাপিছু একবার-ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ চার কিলোগ্রাম। এই পরিমাণটি চিন-এ (বৃহত্তম একবার-ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক উৎপাদক) ১৮ কিলোগ্রাম; আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া-য় ৫০ কিলোগ্রামের বেশি।

পৃথিবীতে উৎপাদিত সমস্ত প্লাস্টিকের ৩৬ শতাংশ নানান মোড়কের কাজে (খাদ্য ও পানীয়ের জন্য একবার-ব্যবহারযোগ্য মোড়ক সহ) ব্যবহৃত হয়। 'প্লাস্টিন্ডিয়া ফাউন্ডেশন' এর এক প্রতিবেদন (২০১৯) অনুযায়ী ২০১৮-১৯ সালে ভারতে ব্যবহৃত মোট ১.৮৫ কোটি টন প্লাস্টিকের ৫৯ শতাংশই মোড়কের কাজে লেগেছিল। উল্লেখ্য, একবার-ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ৯৮ শতাংশ জীবাশ্ম-জ্বালানি থেকে তৈরি। এগুলি তৈরিতে যে পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস বাতাসে মেশে, ২০৪০ সালে তার পরিমাণ আরও ১৯ শতাংশ বাড়বে বলে বিজ্ঞানীদের পূর্বাভাস।

## প্লাস্টিক বর্জ্যের ঠিকানা পরিবেশ

ইউএনইপি জানাচ্ছে, খুব সরু প্লাস্টিক তন্তু দিয়ে তৈরি সিগারেটের ফিল্টার পরিবেশে প্লাস্টিক-বর্জ্যরূপে সবচেয়ে বেশি মেলে। এরপর দেখা যায় খাবারের মোড়ক, প্লাস্টিক বোতল ও তার ছিপি, ক্যারিব্যাগ, স্ট্র, স্টারার প্রভৃতি। দেশের অভ্যন্তরভাগ থেকে প্রধানত বিভিন্ন নদী ও হ্রদের মাধ্যমে প্লাস্টিক-বর্জ্য সমুদ্রে মেশে। সমুদ্র-দূষণের এটি অন্যতম প্রধান

কারণ। হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও বর্তমানে ৭.৫ থেকে ১৯.৯ কোটি টন প্লাস্টিক-বর্জ্য সমুদ্রে দেখা যায়।

পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাকৃতিক তন্ত্র হল সমুদ্র। এটি জলবায়ুকে স্থিতিশীল রেখে গ্রহটিকে প্রাণময় রাখতে এবং মানুষের কল্যাণে সাহায্য করে। প্রশান্ত মহাসাগরে ক্যালিফোর্নিয়া এবং হাওয়াই দ্বীপের মাঝে ক্রমাগত প্লাস্টিক জমে ফ্রান্স-এর আয়তনের ৩ গুণেরও বেশি অঞ্চলজুড়ে এক প্লাস্টিক-বর্জ্যের আবর্ত বা ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়েছে। গবেষক জে লোরেন্স, জে মেইজার প্রমুখ পৃথিবীর প্রথম দশটি দেশ, যারা আশেপাশের জলভাগে প্রতি বছরে সবচেয়ে বেশি প্লাস্টিক-বর্জ্য ফেলে, তাদের এক তালিকা বানিয়েছেন। তালিকায় প্রথমে রয়েছে ফিলিপাইনস (৩,৫৬,৩৭১ মে. টন)। এরপরেই ভারতের স্থান (১,২৬,৫১৩ মে. টন)। পরের আটটি দেশ হল যথাক্রমে মালয়েশিয়া (৭৩,০৯৮ মে. টন), চিন (৭০,৭০৭ মে. টন), ইন্দোনেশিয়া (৫৬,৩৩৩ মে. টন), মায়ানমার (৪০,০০০ মে. টন), ব্রাজিল (৩৭,৭৯৯ মে. টন), ভিয়েতনাম (২৮,২২১ মে. টন), বাংলাদেশ (২৪,৬৪০ মে. টন) এবং থাইল্যান্ড (২২,৮০৬ মে. টন)। পৃথিবীর বাকি দেশগুলি সবাই মিলে সমুদ্রে বর্জ্য ফেলে ১,০১২,৫০০ মে. টন।

বিশ্বজুড়ে বিগত চার দশকের (১৯৭৯- ২০১৯) প্লাস্টিকের ওপর এক সমীক্ষার নিরিখে জানা গেছে, পৃথিবীর নানান সমুদ্রে বর্তমানে প্রায় ১৭০ ট্রিলিয়ন প্লাস্টিক-কণা (২২ লক্ষ টনের বেশি) ভাসমান। এর সহজ মানে হল, পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের জন্য সমুদ্রে ২১,০০০ প্লাস্টিক টুকরো জমেছে। সমীক্ষকদের আশঙ্কা ২০৪০ সালে এই পরিমাণটি দ্বিগুণ হবে।

মানুষ যদি প্লাস্টিক উৎপাদন, ব্যবহার ও যেখানে-সেখানে বর্জ্য ফেলার অভ্যাস না পালটায়, তাহলে ২০১৬ সালে যেখানে জলজ বাস্তুতন্ত্রে প্রতি বছর ৯০ লক্ষ থেকে ১.৪ কোটি টন যে প্লাস্টিক-বর্জ্য মিশত, ২০৪০ সালে তা প্রায় ৩ গুণ বেড়ে প্রতি বছরে ২.৩ থেকে ৩.৭ কোটি টন হবে বলে বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা। লোরেন্স, মেইজার ও তাঁদের সহ-গবেষকরা জানাচ্ছেন (২০২১), পৃথিবীতে ১০০০টিরও বেশি নদী বছরে মাথাপিছু ৮-২৭ লক্ষ টন প্লাস্টিক-বর্জ্য সমুদ্রে জমা করে। পৃথিবীতে প্রতি বছরে সমুদ্রে মেশা নদীবাহিত মোট প্লাস্টিক-বর্জ্যের প্রায় ৮০ শতাংশই আসে এই নদীগুলি থেকে। শহরাঞ্চলের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট নদীগুলি সবচেয়ে বেশি দূষণকারী।

**প্রসঙ্গ ভারত**

ভারতে ১ জুলাই, ২০২২ থেকে ১৯টি রাজ্যে একবার-ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক দ্রব্য উৎপাদন, আমদানি, মজুত, বিলি, বিক্রি ও ব্যবহারে নিষেধ করা হলেও প্রায় ১৬টি রাজ্যে এখনও এর ব্যবহার চোখে পড়ে, যার অর্ধেকের বেশি হল ক্যারিব্যাগ এবং স্ট্র। নিষিদ্ধ প্লাস্টিক দ্রব্য উৎপাদনকারী কেন্দ্র এবং এসব দ্রব্যের উৎপাদন এখনও বন্ধ হয়নি। প্লাস্টিকের বিকল্প কোন কিছু এখনও মানুষের হাতে আসেনি। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক উৎপাদনে হাজার হাজার যেসব মানুষ রয়েছেন, তাঁদের বিকল্প আয়ের খোঁজও দেওয়া যায়নি। নাগরিকদের মধ্যেও একবার-ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা নিয়ে খুব পরিষ্কার ধারণা এখনও গড়ে ওঠেনি।

**অতঃকিম**

বর্তমানে পৃথিবীতে সর্বব্যাপী কোন জিনিস থেকে থাকলে নিঃসন্দেহে সেটি প্লাস্টিক। পানীয় জলে প্লাস্টিক, খাদ্যে প্লাস্টিক, বাতাসে প্লাস্টিক। সর্বোচ্চ পাহাড়চূড়ার আতঙ্ক প্লাস্টিক। ক্ষতিকর এই জিনিসটাতে ভরে গিয়ে গ্রহটি ক্রমশই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বাসযোগ্য আর থাকছে না। আর এটা ঘটে চলেছে কোন পরমাণু যুদ্ধের কারণে নয়, নয় কোন জলবায়ুগত চরম ঘটনায়, বা ভয়ানক কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে। মানুষ ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে প্লাস্টিক-বর্জ্যে। তাই, ধারেকাছের জলাশয় বা নদীতে প্লাস্টিক না ফেলা, বেড়াতে গিয়ে সাগর-সৈকত, হেরিটেজ অঞ্চল বা দর্শনীয় স্থান প্লাস্টিকমুক্ত রাখা এবং মানুষের অপ্রয়োজনীয় প্লাস্টিকের (বিশেষত একবার-ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের কাঁটা-চামচ, স্ট্র, কাপ ইত্যাদি) জিনিসের ব্যবহার এখুনি বন্ধ করা, বাজার করার সময় প্লাস্টিক মোড়কজাত খাদ্যদ্রব্য না কিনে বাড়ি থেকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য থলে, ব্যাগ বা পাত্র নিয়ে গিয়ে তাতে ভরে আনা, যেসব জিনিস প্লাস্টিকের মোড়কে না দিলেও চলে, তা বন্ধ করা, বেড়াতে গিয়ে নিত্যনতুন ফ্যাশনের জামাকাপড় না কেনা (কারণ পৃথিবীর মোট দূষিত বর্জ্য-জলের ২০ শতাংশ আসে ফ্যাশন শিল্প থেকে এবং এই শিল্প পৃথিবীর বাতাসে মোট যে পরিমাণ কার্বন মেশে, তার ১০ শতাংশের ভাগীদার), প্লাস্টিকমুক্ত প্রসাধনী বা সাজগোজের জিনিস ব্যবহার করা (উল্লেখ্য, সাজগোজের জিনিস মাইক্রোপ্লাস্টিকের এক প্রধান উৎস)--- এমন কিছু পরিবেশ-রক্ষাকারী 'শূন্য-বর্জ্য' জীবনযাপনে ক্রমশ নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনীয় প্লাস্টিকের জিনিসগুলিকে যাতে আবার ব্যবহার করা যায়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আর দরকারি মোড়কগুলির গুণমান বাড়িয়ে আরও মজবুত করে সেগুলিকে আবার ব্যবহারের উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

প্লাস্টিকের প্রতি মানুষের বেপরোয়া ঝোঁক মানব সভ্যতাকে বিলুপ্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাবের সমস্ত দিক মানুষের সামনে আসছে। বেশ কিছু বড় বহুজাতিক সংস্থা প্লাস্টিক-দূষণ কমাতে এগিয়ে আসছে। পৃথিবীর বহু দেশের নানান অঞ্চলে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে। প্লাস্টিক বর্জ্যের পুনরাবর্তন থেকে সৃজনশীল নানান জিনিস তৈরির চেষ্টাও চলছে। 'ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট অ্যাসেম্বলি' কেনিয়া-র নাইরোবি-তে অনুষ্ঠিত (০২.০৩.২২) পঞ্চম অধিবেশনে (UNEA-৫.২) এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বিশ্বজুড়ে প্লাস্টিক-দূষণ রোধে ২০২৪ সালের মধ্যে এক আন্তর্জাতিক বাধ্যতামূলক আইনি চুক্তি গড়ে তোলা হবে, যেখানে প্লাস্টিকের উৎপাদন থেকে নিষ্পত্তি পর্যন্ত পুরো পর্বটিই গুরুত্ব পাবে। এটি বাস্তবায়িত হলে প্যারিস চুক্তির পর নিঃসন্দেহে তা হবে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মাইলফলক।

---

**লেখক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, পরিবেশকর্মী ও বিজ্ঞান লেখক**

*e-mail:rayrahul2263@gmail.com • M. 9433575364*

রা জ র্ষি ঘো ষ

# বিবর্তনের পেন্সিল

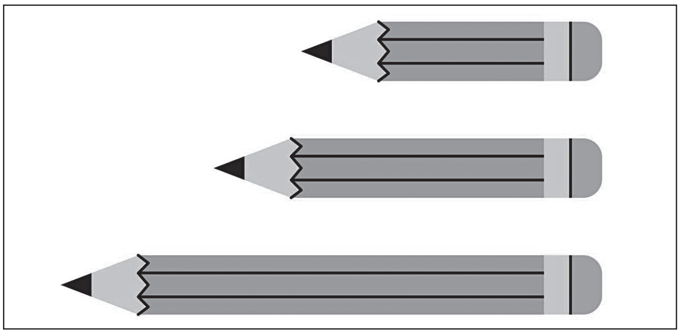

দৈনন্দিন জীবনে কালি কলমের ব্যবহার যতই বাড়ুক না কেন পেন্সিলের ব্যবহার কিন্তু এতটুকু কমে নি। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন নাকি পেন্সিল দিয়েই লিখেছিলেন আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব। টমাস আলভা এডিসন তো নাকি তাঁর বিজ্ঞানের নানা নোট পেন্সিল দিয়েই লিখে রাখতেন। সুকুমার রায় লিখে গেছেন, "এই দেখ পেন্সিল নোটবুক এ-হাতে।" কাজেই নোট নেওয়ার ব্যাপারে সেকালে তো বটেই একালেও পেন্সিলের জুড়ি মেলা ভার। ছোটবেলায় কাগজের উপর লেখার শুরু আমাদের প্রায় সকলেরই পেন্সিল দিয়ে; তার একটা কারণ পেন্সিলে লেখা কোনো কিছু সহজে মোছা যেত (ইরেজার বা রাবার দিয়ে), কলমে যা সম্ভব ছিল না। পেন্সিলে বেশ কিছুদিন হাত পাকাবার পর খানিকটা বড় হয়ে তবে কলমে লেখা শুরুর চল ছিল। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। আশ্চর্য হলেও একথা সত্যি যে রাবার (rubber) বা ইরেজার (eraser) চালু হবার আগে পেন্সিলের দাগ মুছতে পাঁউরুটি ব্যবহারের চল ছিল। একটা পেন্সিল দিয়ে নাকি ৪৫,০০০ শব্দ লেখা যায়! সে না হয় হল, কিন্তু পেন্সিলকে আমরা ছোটবেলায় অনেকেই বলতে শুনেছি উড (wood) পেন্সিল বা লেড (lead) পেন্সিল। এমনটা কেন? উড পেন্সিল কেন এটা বোঝা বেশ সহজ। একটা কাঠের (wood) খোলসের মধ্যে পেন্সিলের সীস থাকে তাই এর নাম উড পেন্সিল। আবার অন্য মতে, একটি কাঠির মাথায় আগুন জ্বালানোর পর নিভে গেলে ঐ পুড়ে যাওয়া কাঠির মাথা দিয়ে নাকি নানান জায়গায় দাগ কাটার কাজ করতেন প্রাচীন মানুষ। সে কারণেও উড পেন্সিল নামটা চালু থাকতে পারে। কিন্তু লেড পেন্সিল কেন? আচ্ছা, পেন্সিলের লেখার নিবকে (nib) 'সীস-ই বা বলে কেন? এই দুটো প্রশ্নের উত্তর-ই একসঙ্গে দেওয়া যায়। 'সীস কথাটা এসেছে সীসা থেকে যাকে ইংরেজিতে বলে লেড (lead)। সীসা হল একটি মৌল। এর পরমাণু ক্রমাঙ্ক ৮২। সীসার আবিষ্কার খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ৬৪০০ বছর আগে। গ্রীক ও রোমানরা এই ধাতুটি দিয়ে কোনো বস্তুর উপর দাগ কাটবার কাজ করতো। পেন্সিল দিয়েও যেহেতু দাগ কাটার কাজ হয় সম্ভবতঃ সে কারণেই পেন্সিলকে লেড পেন্সিল বলে। পেন্সিলে লেডের ব্যবহার কোনোদিন হয়েছে বলে জানা যায় না। মানুষের শরীরের ওপর সীসা বা সীসা-সঞ্জাত বস্তুর নানান বিষক্রিয়া আছে। তাই সীসা দিয়ে দাগ কাটবার কাজ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। পেন্সিল শব্দটার জন্ম ল্যাটিন শব্দ '*penicillus*' থেকে, যার অর্থ ছোট লেজ। প্রাচীন গ্রীস বা রোমে পশুর গায়ের বা লেজের রোম থেকে শিল্পীর ব্যবহারের জন্য যে ছোট তুলি ব্যবহার করা হত তাকেই বলা হত পেন্সিল, যাকে দেখতে ছোট লেজের মতই ছিল। কিন্তু এখন পেন্সিলে লেখার জন্য যা ব্যবহার করা হয় তা হল গ্রাফাইট। গ্রাফাইট কার্বনের একটি রূপভেদ (allotrope)। ১৫৬৪ সালে ইংল্যান্ডের কাম্বারল্যান্ডের (Cumberland) কাছে প্রকান্ড এক ওক গাছ ঝড়ে পড়ে গেছিল। ওই ওক গাছের ভিতর থেকে বেরিয়েছিল একটা প্রকান্ড গ্রাফাইটের টুকরো। কার্বন বা কার্বন-সঞ্জাত যৌগ দীর্ঘদিন ধরে চাপ ও তাপমাত্রায় গ্রাফাইটে পরিণত হতে পারে। গাছের কোটরে পাওয়া গ্রাফাইট সম্ভবতঃ সেভাবেই তৈরী হয়েছিল। স্থানীয় রাখাল ছেলেরা খেয়াল করল ঐ কালো পাথরের টুকরো (যা কিনা গ্রাফাইট) দিয়ে নানা জিনিষের উপর দাগ কাটা যায়। তারা ভেড়ার গায়ে ঐ কালো পাথর দিয়ে দাগ কেটে রাখতো। ব্যাপারটা ব্যবসায়ীদের নজর এড়ালো না। ঐ পাথর লম্বা করে কেটে বাজারে বিক্রি করতে শুরু করলো তারা। শুরু হল বিদেশে রপ্তানিও। এখন সমস্যা হল, প্রকৃতিতে পাওয়া গ্রাফাইটে মিশে থাকে আরো অনেককিছু। তাই ভালো করে দাগ কাটা যায় না। আবার ঐ প্রকৃতিজাত গ্রাফাইটকে শুদ্ধ করে নিলে তা এমন নরম হয় যে লিখতে গিয়ে সামান্য চাপেই ভেঙে যায়। এ ব্যাপারে একটা সমাধান দিলেন জার্মান শিল্পোদ্যোগী ক্যাসপার ফেবার (Kaspar Faber)। বিশুদ্ধ গ্রাফাইটের সঙ্গে সালফার, অ্যান্টিমনি, রেজিন ইত্যাদি মিশিয়ে পেন্সিলের তথাকথিত 'সীস' কে খানিকটা শক্ত করতে পেরেছিলেন তিনি। ফ্রান্সে পেন্সিলের 'সীস' কে শক্ত করতে একটা উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন বিজ্ঞানী নিকোলাস কোঁতে [hydrous aluminium phyllosilicate, $Al_2Si_2O_5(OH)_4$] মিশিয়ে তিনি পেন্সিলের 'সীস'কে শক্ত করেন। পেন্সিলকে কাঠের মোড়ক পরিয়ে তাকে আধুনিক করেন আমেরিকান কাঠ ব্যবসায়ী উইলিয়ম মুনরো (William Munroe)। এভাবেই কয়েকশো বছর ধরে বিবর্তিত হতে হতে পেন্সিল আজকের রূপ পেয়েছে। পরিবর্তনই বিজ্ঞানের নিয়ম। তাই পেন্সিলও সে নিয়মের বাইরে নয়।

**তথ্যসূত্র**

১। পেন্সিল ও কালির আত্মকথা, শ্রীগোলকেন্দু ঘোষ, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ, ১৯৬০, পৃ. ১৭৩-১৭৬

২। The secret science of pencils and erasers, American Chemical Society (https://www.acs.org/education/whatischemistry/adventures-in-chemistry/secret-science-stuff/pencil.html)

**লেখক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান**

*e-mail: rghosh@chem.bur.univ.ac.in • M. 8944830663*

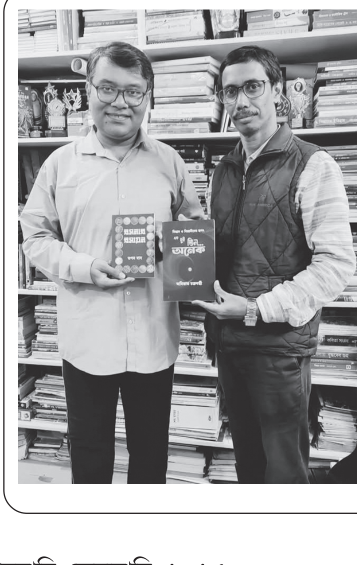

ছবি : বাঁদিকে এক দুই তিন... অনেক বইয়ের লেখক **ড. অমিতাভ চক্রবর্তী**

আর ডানদিকে রসনার রসায়ন বইয়ের লেখক **ড. তপন দাস**

মহাকাশ

ড. শামীম হক মণ্ডল

# গায়া-BH ৩ : আকাশগঙ্গা ছায়াপথের বৃহত্তম কৃষ্ণগহ্বর

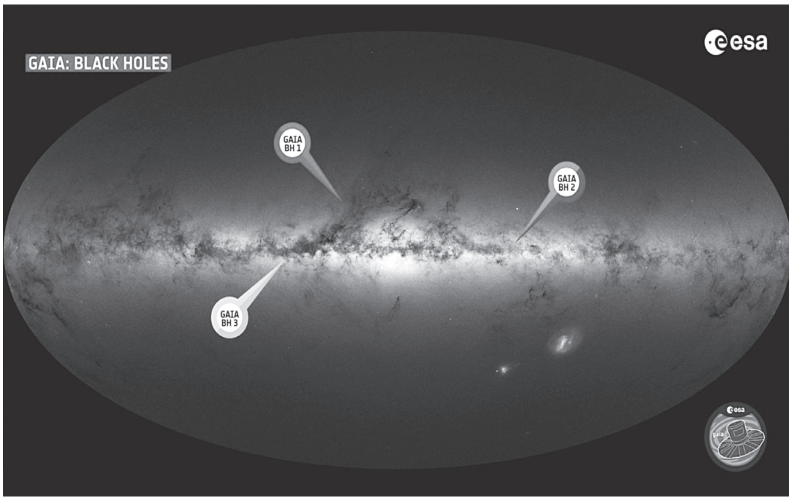


সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ধরা পড়েছে— "গায়া-BH ৩" নামক এক দানবীয় নাক্ষত্রিক ভরের ব্ল্যাক হোল পৃথিবীর কাছাকাছি লুকিয়ে আছে। ভাবা যায়! ইউরোপীয় স্পেস টেলিস্কোপ, "গায়া", যে সর্বক্ষণ আমাদের ছায়াপথের কোটি কোটি নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণ করছে, তার নজরে পড়েছে এই দানবীয় কৃষ্ণ গহ্বরটি। ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বর বিজ্ঞানের এক বহুল আলোচিত ও আকর্ষণীয় মহাজাগতিক বস্তু, যাদের ভিতরে কাজ করা প্রবল মহাকর্ষের জন্যে এরা সবকিছুকে নিজের দিকে টেনে নেয়। কোনো গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, এমনকি আলোও যদি এদের সীমানায় চলে আসে, তাহলে এর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া একরকম অসম্ভব। প্রকৃতিতে সাধারণত তিনরকম ব্লাক হোলের দেখা মেলে— স্টেলার বা নাক্ষত্রিক ব্ল্যাক হোল, ইন্টারমিডিয়েট ব্ল্যাক হোল বা সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল, আর মিনিয়েচার ব্ল্যাক হোল। এর মধ্যে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলগুলির ভর সূর্যের তুলনায় মিলিয়ন, বিলিয়ন গুণ বেশি হয়, এবং এরা সাধারণত ছায়াপথের একদম কেন্দ্রে অবস্থান করে। এরা স্টেলার ব্ল্যাক হোল গুলির মত বিশালাকার নক্ষত্রের মৃত্যুর পর সৃষ্টি হয় না, বরঞ্চ বৃহৎ বৃহৎ ব্লাক হোলগুলির একত্রীকরণের ফলে তৈরী হয় এরা।

নতুন আবিস্কৃত দানবীয় এই কৃষ্ণ গহ্বর— "গায়া-BH ৩" এখনো পর্যন্ত আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের সর্ববৃহৎ কৃষ্ণগহ্বর। সূর্যের ভরের তেত্রিশ গুণ বেশী ভরসম্পন্ন দৈত্যাকার এই ব্লাক হোলটি পৃথিবীর দ্বিতীয় নিকটতম, এটি পৃথিবী থেকে প্রায় ২০০০ আলোকবর্ষ দূরের Aquila নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত। এছাড়াও আমাদের ছায়াপথে Cygnus X ১ নামের আরও একটি বৃহদাকার কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে, যেটি সূর্যের থেকে একুশ ২১ গুণ বড়।

কোনোরকম বিশেষ অভিযানের জন্যে নয়, একরকম হঠাৎ করেই সন্ধান মিলেছে কৃষ্ণগহ্বরটির। প্যারিসের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চ (CNRS) অবজারভেটরিতে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি বা ই এস এর গায়া মিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে বিশ্লেষণ করছিলেন- কি করে আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের একটা নিখুঁত মানচিত্র প্রস্তুত করা যায়। সেখান থেকেই, গায়া BH ৩ নামক কৃষ্ণগহ্বরটির সন্ধান মেলে। গায়া মিশনের নাম থেকেই এই কৃষ্ণ গহ্বরটির নামকরণ করেছেন বিজ্ঞানীরা।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, BH ৩ হল একটি প্যাসিভ ব্ল্যাক হোল বা নিষ্ক্রিয় ব্ল্যাক হোল (এমন একটি ব্ল্যাক হোল যা সক্রিয়ভাবে তার চারপাশ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে না)-অর্থাৎ এর চারপাশে কাছে টানার মত বা গিলে নেওয়ার মত তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পদার্থের সরবরাহ নেই। এটি তার আশেপাশের নক্ষত্র থেকে এতটাই দূরে অবস্থান করছে যে এর থেকে কোনও এক্সরে নির্গত হয় না তাই এদের হদিশ পাওয়া বেশ শক্ত। এই কাজে চিলির আতাকামা মরুভূমিতে অবস্থিত ESO-VLT তে অতিবেগুনী এবং ভিজ্যুয়াল ই চেল স্পেকট্রোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্য ও নিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অবজারভেটোয়ার ডি প্যারিসের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চের (সিএনআরএস) একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী পাসকুয়েল পানুজো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, স্থলভিত্তিক টেলিস্কোপগুলি থেকে প্রাপ্ত আরও তথ্য থেকে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে এটির ভর পূর্বে আমাদের গ্যালাক্সিতে বিদ্যমান যে কোনও কৃষ্ণ গহ্বর থেকে অনেক গুণে বেশী। এই ধরনের আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় এক বিরল দৃষ্টান্ত'।

**তথ্যসূত্র**

1.https://scholar.google.com/citations?user=EoXaA6gAAAAJ&hl=en
2. https://www.researchgate.net/profile/Shamim-Mondal
3. https://inscript.me/profile/shamim-haque-mond al

**লেখক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিচার সহায়ক বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কর্মরত**
e.mail: shamimmondal709@gmail.com • M. 9614519387

*ছবিতে বাঁদিক থেকে অর্চন সমাজদার, ড. তুষারকান্তি নাথ, সুরজিৎ দাস, অনিন্দ্য দে, শিবময় দে, ড. গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, বিজয় সরকার, সৌমেন বিশ্বাস ও প্রবীর বসু। বাঁদিক থেকে (বসে) ড. মাধবী ভট্টাচার্য, রিঙ্কু দাস, জয়দেব দে ও পরেশ রায়।*

সার্ন রিপোর্ট

শ্রীমতি রিঙ্কু দাস

# শিক্ষক শিখনে সার্ন (CERN)

*মহাবিশ্বের কত রহস্যই এখনো অজানা। এইসব রহস্যের কারণ উদ্ঘাটন করতে ভবিষ্যতে আমাদের আরো বেশি বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ার দরকার। শিক্ষকেরাই পারেন এই হবু বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি করতে। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলিকে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করতে পারেন, যাতে তারা ভবিষ্যতে আরো বেশি করে বিজ্ঞান গবেষণায় যুক্ত হতে পারে। তাই সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান শিক্ষকদের এই কাজে ব্রতী করার উদ্দেশ্যে CERN (European Organization for Nuclear Research) প্রতি বছর দুটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রতি বছর জুন মাসে যে প্রোগ্রামটি হয় সেটির নাম lnternational High school Teacher প্রোগ্রাম বা সংক্ষেপে HST, আর আগস্ট মাসে যে প্রোগ্রামটি হয় সেটির নাম lnternational Teacher Week বা সংক্ষেপে lTW.*

*২০২৪ সালে lTW প্রোগ্রামে সারা পৃথিবীর ৩৩টা দেশ থেকে ৪২ জন বিজ্ঞান শিক্ষক অংশগ্রহণ করে। ভারত থেকে যে দুজন শিক্ষক এবার ITW প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার দুর্লভ সুযোগ পায় তার মধ্যে আমি এবং হিন্দু স্কুলের পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক অনিন্দ্য দে।*

## CERN সম্পর্কে দু-চার কথা

১৯৫৪ সালে ইউরোপের ১২টি দেশ মিলে এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে সদস্য দেশ সংখ্যা প্রায় ২৩। সহযোগী সদস্য দেশের সংখ্যা প্রায় ১১টি। ভারত CERN-এর সহযোগী সদস্য। ২০১২ সালে এই CERN এর গবেষণাগারেই খুঁজে পাওয়া যায় একটি মৌলিক কণা যার নাম 'হিগস বোসন'। এই কণাটি আসলে অন্যকনা-দের (যেমন কোয়ার্ক, ইলেকট্রন) 'ভর' প্রদান করে। বিজ্ঞানী পিটার হিগস ১৯৬৪ সালে এই  কনার প্রস্তাব করেন বলে এটিকে হিগস বোসন বলা হয়।

'বোসন' শব্দটি এসেছে বসু বা বোস শব্দ থেকে। এই কণাটির নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম।

১৯৮৯ সালে CERN-এর বিজ্ঞানীরাই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তৈরি করেন World Wide Web বা www।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে মানবজাতির যে মৌলিক প্রশ্নগুলি এখনো অজানা আছে সেইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য CERN এর বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন মাটির ১০০ মিটার গভীরে ২৭ কিলোমিটার পরিধির একটি বৃত্তাকার টানেল যার নাম Large Hadron Collider বা LHC। এটি এখনও পর্যন্ত মানুষের তৈরি সবথেকে বড় উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বিজ্ঞানের গবেষণাগার যেখানে মূলত দুটি বিপরীতমুখী প্রোটন কণার স্রোতকে প্রচন্ড গতিতে (আলোর গতির ৯৯.৯৯% বেগে) ত্বরান্বিত করে মুখোমুখি সংঘর্ষ করানো হয়।

CERN-এ আছে পৃথিবীর একমাত্র 'অ্যান্টি ম্যাটার' (Anti matter) ফ্যাক্টরি। আমাদের চারপাশে সাধারণত আমরা এই অ্যান্টি ম্যাটারদের দেখতে পাই না। আমাদের চারপাশে সব বস্তুই matter বা পদার্থ দিয়ে তৈরি CERN-এর বিজ্ঞানীরা এক বিশেষ পদ্ধতিতে পরীক্ষাগারে Anti matter তৈরি করে তার বিভিন্ন ধর্মগুলি পরীক্ষা করছেন।

## আন্তর্জাতিক শিক্ষক সপ্তাহ (ITW, 2024) থেকে কি শিখলাম?

১. এবছর পৃথিবীর ৩৩টি দেশ থেকে ৪২ জন হাইস্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। দেশগুলোর মধ্যে যেমন ইউরোপের কিছু দেশ জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, গ্রিস, বুলগেরিয়া প্রভৃতি ছিল তেমনই ছিল আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ। এই দেশের শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা এবং তাদের দেশের নানান গল্প শোনা এগুলি উপরি পাওয়া।

২. শুরুতেই আমাদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেওয়া হয় প্রতিটি দলে ৪-৫ জন করে শিক্ষক থাকে। এদের পোশাকি নাম স্টাডি গ্রুপ। এক সপ্তাহ পরে প্রত্যেকটি স্টাডি গ্রুপকে ১০ মিনিটের একটি উপস্থাপনা দিতে হয়, যেখানে তারা এই প্রোগ্রামটি থেকে কতটা শিখেছেন বা কতটা জ্ঞান ফিরে গিয়ে নিজের ক্লাসরুমে প্রয়োগ করতে পারবেন তার একটি খসড়া রিপোর্ট দিতে হয়। ১৪ দিনের প্রোগ্রামের শেষেও প্রত্যেকটি দলকে আবার একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট দিতে হয়। এছাড়াও আমাদের তিনবার 'কনসেপ্ট ম্যাপিং' করতে দেওয়া হয়।

৩. CERN-এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী ও খ্যাতনামা অধ্যাপকেরা আমাদের সামনে তুলে ধরেন CERN-এর অত্যাশ্চর্য প্রযুক্তি ও কণা পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন চমকপ্রদ বিষয়।

LHC টানেলের মধ্যে প্রোটন কণার স্রোতকে আলোর কাছাকাছি বেগে ত্বরান্বিত করার বিষয়টি বোঝানো হয়। তড়িৎ ক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রোটন কণাগুলির ত্বরণ ঘটানো এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের মাধ্যমে কণাগুলিকে একটি বৃত্তাকার পথে ছোটানো হয়। এই পুরো টানেলটি তৈরি আসলে প্রায় ১৭০৬ টি তড়িৎ চুম্বক দ্বারা, এই চুম্বকগুলি আবার অতি পরিবাহী (super conductor) পদার্থ দিয়ে তৈরি। পুরো টানেলটিকে ultra vacuum বা অতি বায়ু শূন্যস্থান (এখানে বায়ুর চাপ এক মিলিবারের হাজার কোটি ভাগের একভাগ) হিসেবে তৈরি করা হয়েছে এবং এর ভিতরের তাপমাত্রা রাখা হয় পরমশূন্য তাপমাত্রার মাত্র দু-ডিগ্রি সেলসিয়াস ওপরে অর্থাৎ মাইনাস ২৭১ ডিগ্রী সেলসিয়াসে।

এর ৪টি জায়গায় বসানো আছে ডিটেক্টর, সহজ কথায় বললে এই ডিটেক্টরগুলি হল আসলে বিশাল দৈত্যাকার ডিজিটাল ক্যামেরা, যেগুলির সাহায্যে প্রোটন প্রোটন সংঘর্ষে উৎপন্ন বিভিন্ন কণাগুলির উপস্থিতি বোঝা সম্ভব হয়। এগুলোর নাম হলো যথাক্রমে ATLAS, CMS, ALICE এবং LHCB.

৪. কিভাবে ক্লাসরুমে কনা পদার্থবিদ্যকে খুব সহজে মজার খেলার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উপস্থাপনা করা যায় তাও আমাদের শেখানো হয়। প্রতিটি আলোচনার শেষে একটি প্রশ্ন-উত্তর পর্বের ব্যবস্থা থাকে যেখানে শিক্ষকেরা যেকোনো প্রশ্ন নির্দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

৫. এছাড়াও আমাদের গাড়িতে করে ৪টি ডিটেক্টর দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে লিফটে করে ১০০ মিটার তলায় নেমে এই বিশাল গবেষণাগারটি দেখা সত্যিই ভীষণ চমকপ্রদ বিষয়। এছাড়াও CERN এর Science Gateway নামক একটি বিশাল প্রদর্শনী ঘুরে দেখানো হয়।

৬. খুব সহজে Cloud chamber তৈরি করানো শেখানো হয়। এর মাধ্যমে সাধারণ অবস্থায় বায়ুতে উপস্থিত বিভিন্ন কণাদের (যেমন, মিওন, ইলেকট্রন ও প্রোটন) গতিপথ সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়।

৭. এছাড়াও কিভাবে 'Mystery box' তৈরি করার মাধ্যমে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের ডার্কম্যাটার সম্পর্কে ধারণা দিতে পারি তা বোঝানো হয়।

**লেখক প্রদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষিকা ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক, বারুইপুর গার্লস হাই স্কুল**

*e-mail: sunandarinkudas@gmail.com • M. 9163948267*

অ ঙ্কি তা সে ন গু প্ত

# সীমানা ছাড়িয়ে.......

একক, দশক, শতক, হাজার-এর পরেরটা আমাদের সকলের জানা। কিন্তু কত পর্যন্ত? একটা তালিকার কথা বলি যা আছে যজুর্বেদ সংহিতায়।

এক, দশ, শত, অযুত, নিযুত, প্রযুত, অর্বুদ, ন্যায়ার্বুদ, সমুদ্র, মধ্য, অন্ত, পরার্ধ অর্থাৎ যথাক্রমে 1, 10, $10^2$, $10^3$, $10^4$, $10^5$, $10^6$, $10^7$, $10^8$, $10^9$, $10^{10}$, $10^{11}$, $10^{12}$।

আমাদের কাছে আজ সমুদ্র মানে সুদূরবিস্তৃত জলরাশি কিন্তু এখানে তো $10^9$। এই তথ্য আমরা ক'জন জানি আর জানবই বা কেন? আমাদের রোজকার জীবনে এর ব্যবহার নেই তাই আমাদের মত সাধারণ মানুষদের এই নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ভাবার কথা নয়।

যা ব্যবহার হয় না অন্তত তার হারিয়ে যাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু যার ব্যবহার ফুরোয় না সে কি হারায়? যেমন হারায়নি মানব সভ্যতাকে দেওয়া প্রাচীন ভারতের দুটি উপহার— দশমিক পদ্ধতি আর শূন্য।

সেই কবেকার চিন্তা, আমাদেরই প্রতিনিধিরা করেছিলেন যা দেশ, কাল, পাত্রের বেড়াজাল পেরিয়ে আজও মানব সভ্যতার সঙ্গী।

$$0 + 0 = 0$$
$$0 - 0 = 0$$
$$0 \times 0 = 0$$
$$0^2 = 0$$

সংখ্যা হিসাবে শূন্যের ধর্মগুলি প্রথম যে গ্রন্থে পাওয়া যে সেটি হল ব্রহ্মগুপ্তের রচিত 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত' যার রচনাকাল হল ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ সপ্তম শতক। ততদিনে ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে চিন, কোরিয়া, জাপান, বার্মা, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলিতে। এই বৌদ্ধ ধর্মই কালক্রমে ভারত ও চিনের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মাধ্যম হয়ে ওঠে; হয়ে ওঠে বিজ্ঞানের বাহক। বিভিন্ন অনুবাদ ও পন্ডিত ব্যক্তিদের আগমনের মাধ্যমে ভারতীয় গণিতের সাথে পরিচিত হয় চিন। অষ্টম শতকের প্রথম দিকেই ব্রহ্মগুপ্তের কাজ সম্পর্কে অবহিত ছিল সেই দেশ। সম্ভবতঃ ভারতের প্রভাবে চিনে শূন্যকে বৃত্তাকার চিহ্নরূপে প্রকাশ করতে দেখা যায়। সর্বপ্রথম যাঁর কাজে এটি পরিলক্ষিত হয় তিনি ছিলেন কিন জিউসাও (Qin Jiushao)।

চিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই গণিতবিদ সম্পর্কে George Gheverghese Joseph বলেছেন,

"The little we know of Qin's character is not very flattering. He was considered by some of his contemporaries as unprincipled, extravagant, and boastful,... But nobody denies his remarkable versatility. He was well versed in astronomy, harmonics, mathematics, and even architecture.

In sports, there were few to match him in polo, archery, or swordplay."

১২৪৭ সালে কিন জিউসাও লিখেছিলেন সু সু জিউ ঝ্যাঙ (Shu Shu Jiu Zhang) বা Nine Sections of Mathematics। কাজটি ঠিক কেমন ছিল তার আন্দাজ পাওয়া যাবে Luke Hodgkin-এর উক্তিতে,

"The Shushu jiuzhang is a complex work, organized around practical problems but often dealing with them in far-fetched ways."

ব্যবহারিক গণিত যেমন ক্যালেন্ডার তৈরি করা কিংবা সৈন্যবাহিনী গঠন করা অথবা শত্রু শিবিরের দূরত্ব নির্ণয় করা ইত্যাদি। একটি সমস্যার কথা বলা যাক যথাসম্ভব আমাদের বোঝার ভাষায়,

এমন একটি শহরের কথা ভাবা যাক যেটি বৃত্তাকার এবং প্রাচীরবেষ্টিত। প্রাচীরের গায়ে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে অবস্থিত চারটি প্রবেশ দ্বার দিয়ে শহরে যাওয়া আসা করা যায়। উত্তর দ্বার থেকে তিন একক দূরত্বে একটি গাছ আছে। দক্ষিণ দ্বার থেকে বেরিয়ে পূর্বে নয় একক দূরত্ব গেলে গাছটি দেখা যাবে। তাহলে শহরের ব্যাসের দৈর্ঘ্য ও পরিধি নির্ণয় করতে হবে।

সমস্যাটিকে গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করলে হয়,

$x^{10}+15x^8+72x^6-864x^4-11664x^2-34992 = 0$ যেখানে $x^2$ হল শহরের ব্যাসের দৈর্ঘ্য।

সামান্য একটা প্রশ্ন থেকে তৈরি হলো সমীকরণ। যে সমীকরণ সম্বন্ধে বিদ্যালয় স্তরের গণিতের সৌজন্যে আমাদের সবারই অল্পবিস্তর ধারণা আছে। এখানে সমীকরণের মাত্রা একটু বেশি আমাদের চেনা পরিচিত গণ্ডির থেকে, এই যা।

এখন ক্যালেন্ডার তৈরি করতে গিয়ে যা করতে হতো তা হল বিশাল তথ্যের মধ্যে সম্পর্কের সমাধান। সাধারণত কিছু বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা সমাধান নির্ণয় করা হত। ভারতে এই ধরনের সমস্যার উপর যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ব্রহ্মগুপ্ত।

প্রাচীন চিনে কিন জিউসাও এর উপর যে কাজ করেছিলেন ইউরোপে তার উত্তরসূরী ছিলেন অয়লার (Euler) ও গস (Gauss)। ব্যবধান প্রায় পাঁচশ বছরের।

ভেবে দেখবার বিষয় যা তা হল, ক্যালেন্ডার হোক বা সৈন্যবাহিনী, স্থাপত্য হোক বা কর কোনটাই কিন্তু আমাদের জীবনে অপ্রাসঙ্গিক নয়। কালকেও ছিল না, আগামীতেও হবে না। নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের সাথে জুড়ে থাকা বিষয়গুলির সমাধান করতে গিয়েই আমাদের করতে হয়েছে গণিতচর্চা যা গণিত তথা মানব সভ্যতার উভয়েরই বিকাশের পথ প্রশস্ত করে চলেছে। গণিত কোন দূরের বস্তু নয়।

গণিত আছে আমাদের চারিপাশেই সাধারণ থেকে অসাধারণ সকল কিছুর মধ্যেই। শুধু তাকে চিনে নিতে হবে, হোক সে পরিচিত সীমানার মধ্যে বা সীমানা ছাড়িয়ে।

## তথ্যসূত্র

1. Bag, A.K.(1979).Mathematics in Ancient and Medieval India.Chaukhamba Orientalia.
2. B.S Yadav, Man Mohan (Ed.) (2008). Ancient Indian Leaps into Mathematics Birkhauser.
3. Hodgkin Luke.(2005). A History of Mathematics : From Mesopotamia to Modernity. Oxford University Press.
4. Joseph, George Gheverghese (2011). The Crest of the Peacock : Non-European Roots of Mathematics. Princeton University Press.
5. Plofker, Kim. (2009). Mathematics in India. Princeton University Press.
6. Srinivasiengar, C.N. (1988). The History of Ancient Indian Mathematics. The World Press Private Ltd.

লেখক গণিতের শিক্ষিকা

*ankitasengupta57@gmail.com • 9748685280*

ডা. সুকান্ত মুখার্জী

# আশীষ মুখার্জী

*ফেসবুকের মাধ্যমেই খবর পাওয়া গেল আশীষবাবু প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কবে কিভাবে প্রথম পরিচয় হয়েছিল তা আজ আর মনে নেই। তবে আমাদের নানা অনুষ্ঠানে তিনি প্রায়ই আসতেন এবং আমি অন্তত বারদুয়েক কোন না কোন কাজে ওনার বাড়ি গিয়েছি তা পরিষ্কার মনে আছে। উনি জাহাজে কাজ করতেন এবং ওনার লেখা দুটি বই আমাকে উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন। তবে ঘটনা যাই হোক না কেন আমাদের সকলের যোগসূত্র ছিলেন একজনই, আর সেটা আর কেউ নয় আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই ড. রমাতোষ সরকার। তাঁর জীবৎকালেই আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চায় মেতে উঠেছিলাম ও নানা মহাকাশীয় ঘটনায় অংশগ্রহণ করা শুরু করেছিলাম।*

আমার কাছে থাকা যে সব কাগজপত্র এতদিন ধরে সযত্নে রক্ষিত আছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে কলকাতায় অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র রাণার অকালমৃত্যুর পর প্রথম স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রধানত আশীষবাবুর উদ্যোগে। দিনটি ছিল ২৭ আগস্ট ১৯৯৭ বিকাল ৫ টায়।

বিষয় : Social and Technical Aspects of Late Prof. Narayan Chandra Rana

এই উপলক্ষে এক পুস্তিকায় দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখা ছিল। তার একটি আশীষবাবুর লেখা যার শিরোনাম ছিল— 'নারায়ণ চন্দ্র রানার সঙ্গে শেষ দশ বছর'— এই লেখায় আশীষবাবু ১৯৮১ সালে তাঁর সাউরী গ্রামে যাওয়া, পরে ১৯৮৭ সালে অধ্যাপক রানার বোম্বাইএর কোয়ার্টারে গিয়ে তাঁর সংগ্রহে থাকা ১০″ টেলিস্কোপটি কিভাবে ট্রেনে বুক করে খড়গপুরে নামিয়ে সাউরী গ্রামে অধ্যাপক রানার মাষ্টারমশাই মনীন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন। ১৯৯১ সালে মণিবাবুর মৃত্যুর দু-বছর পর তৈরি হয় তাঁর নামে এক অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ট্রাস্ট। ১৯৯৪ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে এই ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ সারা ভারত অপেশাদার জ্যোতির্বিদ সম্মেলন যেখানে প্রায় ৪০০ জন শখের জ্যোতির্বিদ উপস্থিত ছিলেন। ঐ সম্মেলনেই গঠিত হয় 'কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এমেচার অ্যাস্ট্রোনমার্স', উদ্দেশ্য ছিল সারা ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চাকে ছড়িয়ে দেওয়া। অবশ্যই এই কাজে অধ্যাপক রানার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই লেখাটিতে আশীষবাবু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অধ্যাপক রানার চরিত্রে নানা অসাধারণ গুণাবলীর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।

অপর লেখাটি লিখেছিলেন আমাদের স্যার ড. রমাতোষ সরকার, লেখার শিরোনাম ছিল 'নারায়ণ চন্দ্র রানা : স্মৃতিচারণা'। এই লেখায় স্যার অধ্যাপক রানার বেড়ে ওঠা, তাঁর জীবনে শিক্ষকদের প্রভাব প্রভৃতির পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত পড়াশোনা ও কর্মজীবন নিয়েও সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। কলকাতা বইমেলায় দুজনে একসাথে গিয়েছেন, হাতে সময় কম থাকা সত্ত্বেও কিভাবে সেই স্বল্প সময়ে অধ্যাপক রানা দু-তিনটি বই যার মধ্যে ছিল সাহিত্য সংসদ এর প্রকাশনার 'বাংলা ব্যাকরণ অভিধান' সেটি কেনারও উল্লেখ করেছেন।

আশীষবাবুর উদ্যোগে কলকাতায় (S.N. Bose National Centre for Basic Sciences-এ ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় সারাদিনব্যাপী এক চমৎকার সেমিনার যার শিরোনাম ছিল 'Leonids 98 : A Postmortem' এই অনুষ্ঠানেই প্রথম আমার সুযোগ হয়েছিল অধ্যাপক সন্দীপকুমার চক্রবর্তীর Uncertain Universe from Galaxy to Comets and Asteroids নামক প্রায় ৪৫ মিনিট ব্যাপী অনবদ্য আলোচনা শোনার এবং ঠিক তার পর পরেই অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া Meteors and Meteor Showers আরেকটি অপূর্ব আলোচনা শোনার। সেদিন গোটা দিনজুড়েই ছিল মিটিওর শাওয়ার নিয়ে নানাজনের নানা অভিজ্ঞতার কথা। এই উপলক্ষে Astro Update নামে অর্ণব রায় সম্পাদিত এক ছোট পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল।

উল্কাবর্ষণ নিয়ে আশীষবাবুর লেখা একটি লিফলেটও প্রকাশিত হয়েছিল। ১১ মে ২০০০ সালে আশীষবাবু সি.আই. আই. এ.এ নিয়ে একটি সভা আহ্বায়ক লিফলেট প্রকাশ করেন। এই লিফলেটে তিনি C.I.A.A (The Confederation of Indian Amateur Astronomers)-এর প্রেসিডেন্ট হিসাবে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন যে এই প্রতিষ্ঠান আসলে প্রায় ৫০টি সংস্থার এক যৌথ প্রয়াস। এটির নিবন্ধীকরণ বা রেজিস্ট্রেশন হয়েছে পুণায়, সেক্রেটারিয়েট আছে দিল্লীতে এবং কলকাতায় আছে রিজিওনাল সেন্টার।

কলকাতার সি আই টি রোডে ফুলবাগানের কাছে মানিকতলা ভি আই পি বাজারের ছাদে একটি ১০″ নিউটোনিয়ান ইকুইটোরিয়াল মাউন্টেড মোটরচালিত টেলিস্কোপ বসিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে আকাশ দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং সেইসঙ্গে লাইব্রেরি, কম্পিউটার সেন্টার ও স্থায়ী প্রদর্শনীর ভাবনাচিন্তা নিয়ে একটি সভা আহূত হয়েছিল ৩১ মে ২০০০ সালে বিড়লা তারামন্ডলের সভাঘরে।

যাইহোক আমাদের কোর্স শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা এডভান্সড কোর্স করার জন্য বি. আই. টি. এম এ আলাদা করে ভর্তি হলেও স্যারের মৃত্যুর পর তারামন্ডলে যে শোকসভা হয়েছিল সেখানে ও আমাদের পরবর্তী বেশ কিছু অনুষ্ঠানে আশীষবাবু উপস্থিত ছিলেন। সেইসময় আমাদের সঙ্গে কলকাতার আরও কিছু আকাশচর্চার প্রতিষ্ঠান যেমন স্কাই ওয়াচার্স এসোশিয়েশন, ব্রেক থ্রু সায়েন্স সোসাইটি প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। স্যারের মৃত্যুর পর আমরা যে এলামণি সংগঠন তৈরি করেছিলাম ও পরে বি আই টি এম এস্ট্রোনমি ক্লাব— তার অনেক অনুষ্ঠানেই আশীষবাবু উপস্থিত ছিলেন বেশ মনে আছে। তবে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হত উনি বরাবরই কাজের মানুষ। জাহাজে চাকরি করলেও এবং ধনাঢ্য হলেও বাইরে তার প্রকাশ কখনও দেখাতেন না। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কলকাতা বইমেলায় (তখন বইমেলা ময়দানে হত) টেলিস্কোপ নিয়ে গিয়ে ওই ভীড়ের মধ্যেও আকাশ দেখার ব্যবস্থা করতেন।

আক্ষেপ একটাই কলকাতার নানা সংস্থাকে নিয়ে লেখালেখি করলেও আশীষবাবুকে নিয়ে কোন লেখা করা হয়নি। আকাশপ্রেমী এই মানুষটির স্মৃতির প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

**লেখক চিকিৎসক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক**

*e-mail:sukanta60@gmail.com • M. 7001223049*

মা ল বি কা দে

# কত অজানারে জানাইলে তুমি

*আমরা এখন ডিজিটাল যুগে রয়েছি। আমাদের প্রায় সবার কাছেই রয়েছে কম্পিউটার, ট্যাবলেট, স্মার্টফোনের মতো ডিজিটাল যন্ত্র। এই সমস্ত যন্ত্রে রয়েছে ইন্টারনেট বা আন্তর্জাল সংযোগ। স্মার্টফোনের আন্তর্জাল সংযোগ আমরা পাই সিম কার্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছ থেকে (যেমন— ভোডাফোন, বিএসএনএল, জিও, ভারতী এয়ারটেল ইত্যাদি)। কম্পিউটারের আন্তর্জাল সংযোগ আমরা পাই ল্যান বা ওয়াই-ফাই এর মাধ্যমে। বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইসের সাহায্যে এবং আন্তর্জাল সংযোগের মাধ্যমে আমরা সারা পৃথিবীর সাথে জুড়ে থাকি। আন্তর্জাল ঘেঁটে আমরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি। আন্তর্জাল আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং যুগান্তকারী আবিষ্কার।*

## ইন্টারনেট কী?

ইন্টারনেট বা আন্তর্জাল সংযোগ ছাড়া আজকের পৃথিবী অচল। খুব সহজে বলতে গেলে ইন্টারনেট হল অসংখ্য কম্পিউটারের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত সংযোগ। আমাদের স্মার্টফোনগুলোও হল কম্পিউটারের ক্ষুদ্র সংস্করণ। সিম কার্ডের মাধ্যমে আমাদের ফোন আন্তর্জাল সংযোগের টেলিকম সার্ভিস প্রোভাইডারের সাথে যুক্ত হয়। এই আন্তর্জাল সংযোগের মাধ্যমে আমাদের ফোন একটি বড় কম্পিউটারের (যাকে পরে আমরা 'সার্ভার' বলে জানব) সাথে যুক্ত হয় যেখানে এরকম আরো লক্ষ লক্ষ কম্পিউটার যুক্ত রয়েছে অদৃশ্যভাবে।

এখন যদি আমরা স্মার্টফোন বা কম্পিউটারে কোন তথ্য জানতে চাই, তখন আমাদের ফোন বা কম্পিউটার ইন্টারনেটের মধ্যে দিয়ে সেই তথ্যের কাছে পৌঁছানোর (অ্যাক্সেস) অনুরোধ পাঠায়। যেমন, আমি যদি জানতে চাই আমাদের এখানে ভাল আম কোথায় পাওয়া যায়, অথবা আমাদের এখানে ভাল রেস্তোরাঁ কোথায় আছে— এই দুটি তথ্য কিন্তু আলাদা ধরনের এবং এই তথ্য দুটি একই জায়গায় যায় না। আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার আমাদের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যকে একটি বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দেয়। সেই বিশেষ জায়গাটির নাম 'সার্ভার'।

## সার্ভার কী?

সার্ভার হল খুব বড় কম্পিউটার, যেখানে ওয়েবসাইট, ভিডিও গেম বা অন্যান্য অনলাইন বিষয় জমা থাকে। যখন আমরা কোন বিশেষ তথ্য জানতে চাই, তখন আমাদের অনুরোধ সেই সার্ভারে জমা পড়ে এবং সার্ভার থেকে তথ্য আমাদের কম্পিউটারে এসে পৌঁছায়। তো এই তথ্য আসা-যাওয়ার পথের মাঝে সেটি কোথাও হারিয়ে যায় না কেন? কারণ, যেরকম আমরা কোন গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য মানচিত্র অনুসরণ করে নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে সেখানে পৌঁছাই, সার্ভার থেকেও ঠিক সেরকমভাবেই তথ্য ইন্টারনেটের নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছায়'। এই পথে তথ্য আমাদের ডিভাইসে এসে পৌঁছানোর পর আমরা সেটি আমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাই। গোটা বিষয়টা অনেকটা চিঠি পাঠানোর মতো। আমরা যদি চিঠিতে কোন বক্তব্য লিখে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাই, তারপর চিঠির প্রাপক আমাদের চিঠি পড়ে তার উত্তর আবার একই পথে ফেরত পাঠান— বিষয়টি ঠিক সেরকম। এখানে পোস্ট অফিসের মতো সঠিক ঠিকানায় তথ্য পৌঁছানোর ভূমিকা গ্রহণ করে 'সার্ভার'। চিঠির খামের মতোই এই পদ্ধতিটি ডেটা প্যাকেটের মাধ্যমে হয়। পার্থক্য একটাই— চিঠি পৌঁছাতে অনেক দিন সময় লাগে, কিন্তু ইন্টারনেটে তথ্য নিমেষে পৌঁছায়।

## ওয়েবসাইট কী?

স্মার্টফোনে যখন আমরা তথ্য সার্চ করি, তখন একটা ওয়েবসাইট খুলে যায়। ওয়েব-এ যে সাইট রয়েছে, তাকে আমরা 'ওয়েবসাইট' বলি। 'ওয়েব' মানে 'জাল' আর 'সাইট' মানে 'একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা'। এই ঠিকানা আন্তর্জাল-এর মধ্যে নির্দিষ্ট একটি স্থান। ওয়েবসাইটকে আমরা একটা ডিজিটাল বই-এর সাথে তুলনা করতে পারি। বইতে যেমন অনেক পৃষ্ঠা থাকে, এখানেও ঠিক তাই। আমরা যে ওয়েবসাইট সার্চ করি, বই এর মতো সেই নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাটি খুলে যায়। এই পৃষ্ঠায় লেখা, ছবি সহ অনেক কিছু থাকে।

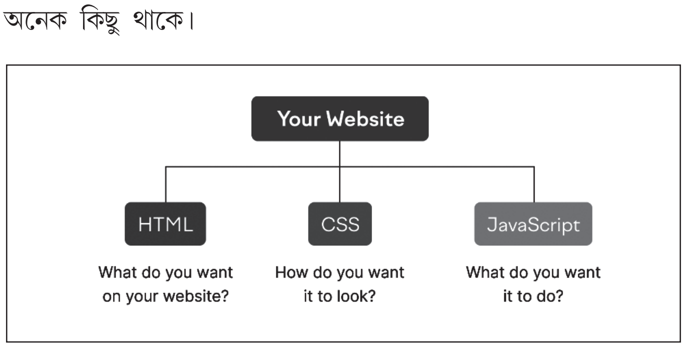


এই ওয়েবসাইট কীভাবে কাজ করে? ওয়েবসাইট হল কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর একটি সেট, যে প্রোগ্রামিং কেউ তৈরি করে ইন্টারনেটে রেখেছে। ইন্টারনেটে নির্দিষ্ট জায়গায় এই প্রোগ্রামিং রাখাকে বলে 'ওয়েব

হোস্টিং'। এই হোস্টিং করার আগে আমাদের ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয়।

কম্পিউটার আমাদের মতো লেখ্য ভাষা বোঝে না। কম্পিউটার যে ভাষা বোঝে তা হল 'প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ' যেমন- Fortran C, C++, Python ইত্যাদি। এই ভাষায় কম্পিউটারকে নির্দেশাবলি দিতে হয়। এই সম্পূর্ণ নির্দেশাবলিকে এককথায় বলে 'প্রোগ্রামিং'। খুব বড় প্রোগ্রামিং জটিলভাবে কাজ করে ওয়েবসাইটের ভিত তৈরি করে।

### কীভাবে তৈরি হয় ওয়েবসাইট

এই ভিত তৈরি করতে আমাদের প্রয়োজন হয় HTML বা Hyper Text Markup Language। এটা হল একটা বাড়ি তৈরির নকশার মতো। বাড়ির নকশা যেমন বলে দেয় যে বাড়িতে কোথায় কী থাকবে, ঠিক সেভাবেই HTML একটি ওয়েবসাইটের কোথায় কী ধরনের বিষয় থাকবে, তা ঠিক করে।

এভাবে বাড়ির খাঁচা তৈরির মতো ওয়েবসাইটের প্রাথমিক গঠন হয়ে গেলে আমরা তাতে আরও কিছু উপাদান যোগ করতে পারি, যেগুলো ভার্চুয়াল উপাদান বা টেকনিক্যাল ভাষায় বললে website layout এবং user experience design (UX)। এর জন্য আমাদের CSS-এর সাহায্য নিতে হয়। CSS  হল Cascading Style Sheet। এর সাহায্যে

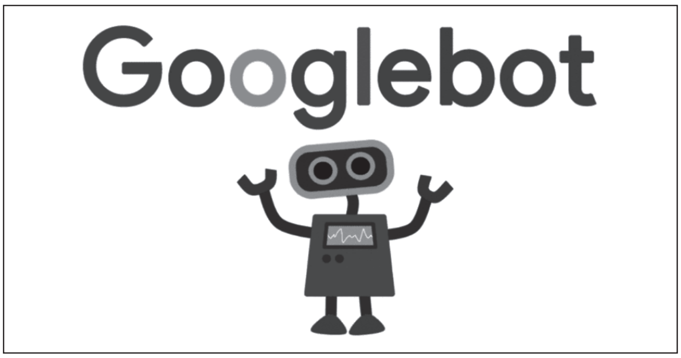


আমরা ওয়েবসাইটের খাঁচাকে একটা পরিপূর্ণ রূপ দিই। অর্থাৎ এর সাহায্যে ওয়েবসাইটের পেজ-এর রং, নকশা কেমন হবে, তার লেখা কেমন হবে, তা ঠিক করি।

এগুলো তৈরি হয়ে গেলে আরও উন্নত কিছু উপাদান যোগ করা যায়। যেমন, আজকাল অনেক ওয়েবসাইটেই আমরা চলমান ছবি, অ্যানিমেশন ইত্যাদি দেখতে পাই, যা দেখে আমরা ওয়েবসাইটটি সম্পর্কে আগ্রহী হই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা যখন অনলাইনে কোন ওয়েবসাইটে কিছু কেনাকাটা করতে যাই, তখন নানা ধরনের রঙচঙে চলমান বিজ্ঞাপন দেখে কোনও বিশেষ দ্রব্যের প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই। এই রঙিন চলমান ছবি, অ্যানিমেশন আমরা তৈরি করি 'জাভা স্ক্রিপ্ট' এর সাহায্যে। জাভা স্ক্রিপ্ট হল এক ধরনের ওয়েবসাইট গঠনকারী প্রোগ্রামিং। এটি ওয়েবসাইটের মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করে।

একটি উন্নত ওয়েবসাইট গঠনের ধাপগুলি নিচে দেওয়া হল—

১) প্রথমে খাঁচা গঠন HTML-এর সাহায্যে।

২) তারপর রঙ, নকশা তৈরি করা হয় CSS-এর সাহায্যে।

৩) এরপর জাভা স্ক্রিপ্ট-এর সাহায্যে আরও উন্নত গতিশীল বিষয়বস্তু আমরা ওয়েবসাইটে যোগ করতে পারি।

### ওয়েবসাইট দেখতে কী প্রয়োজন

এত কিছুর পরেও কিন্তু আমরা সার্চ করেও এই ওয়েবসাইটটিকে দেখতে পাব না। ওয়েবসাইটটিকে দৃশ্যমান করার জন্য সেটিকে ওয়েব-এ 'আপলোড' করে 'স্টোর' করতে হবে। এই পদ্ধতিটির নাম হল 'স্টোরিং দ্য ওয়েবসাইট'। এই পদ্ধতিটি সম্পন্ন করার জন্য আমাদের একটি সার্ভার কম্পিউটারের প্রয়োজন হয়। আগেই বলেছি, সার্ভার কম্পিউটার হল একটি বিশাল কম্পিউটার, যার সংরক্ষণ ক্ষমতা এবং প্রসেসিং ক্ষমতা আমাদের সাধারণ কম্পিউটারের থেকে অনেক গুণ বেশি। এরকম একটি সার্ভার কম্পিউটারে ওয়েবসাইটটিকে প্রথমে সংরক্ষণ করতে হবে। এই সার্ভার কম্পিউটারটি আমাদের সামনে না থাকলেও ইন্টারনেটের সাহায্যে

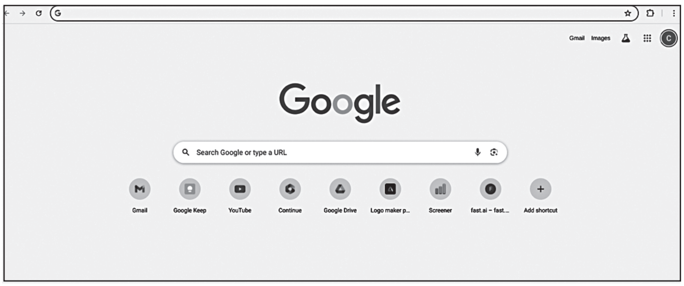


আমরা অনেক দূরে অবস্থিত কোন সার্ভার কম্পিউটারেও ওয়েবসাইটটিকে 'স্টোর' বা সংরক্ষণ করতে পারি। সার্ভারকে আমরা একটা ডিজিটাল লাইব্রেরি হিসেবে ভাবতে পারি, যেখানে ওয়েবসাইটের সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ করা থাকে।

এই সংরক্ষণের পর ওয়েবসাইটের একটি নাম, ঠিকানা দেওয়া প্রয়োজন, ঠিক যেমন চিঠি পৌঁছানোর জন্য বাড়ির ঠিকানা প্রয়োজন। ওয়েবসাইটের এই নাম দেওয়া হয় কম্পিউটারের ডিজিটাল ভাষায়। প্রথমে একটি কম্পিউটারকে নিউমেরিক বা সংখ্যাযুক্ত একটি IP address এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। যাতে সার্ভার অন্তর্জাল এর মাধ্যমে ঐ IP address দ্বারা নির্দিষ্ট কম্পিউটারকে চিনতে পারে। এরপর প্রতিটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা হিসেবে একটি ডোমেইন নেম যুক্ত করা হয় ওয়েবসাইটের সাথে। অর্থাৎ আমরা যখন কোন ওয়েবসাইট সার্চ করি (যেমন, www.google.com), আমরা সহজে বুঝতে পারি সেটি এরকম একটি ঠিকানা বা 'ডোমেইন নেম'।

এইভাবে আমরা একটি ওয়েবসাইটকে সার্ভারে 'স্টোর' করি ও একটি ডোমেইন নেম যুক্ত করি। সার্ভারের সাথে এভাবে ডিজিটাল ফাইল যুক্ত করার পদ্ধতিটিকে আমরা বলি 'ওয়েব হোস্টিং'। এই কাজটি করার জন্য কিছু ওয়েব হোস্ট আছে (go daddy hostinger এরকম কিছু বাণিজ্যিক সংস্থা), যারা এই কাজটি করে থাকে। আর ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তু পরিচালনা করার জন্য রয়েছে কিছু open source Content Management System (যেমন, wordpress, joomla webflow)।

### ওয়েব ব্রাউজার কী এবং কীভাবে কাজ করে

এরপর প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা এই ওয়েবসাইট পর্যন্ত পৌঁছাব কী করে? এই কাজটি করার জন্য আমাদের কম্পিউটারে এক ধরনের সফটওয়্যার থাকে, যাকে আমরা বলি 'ওয়েব ব্রাউজার'। কয়েকটি জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজার হল google chrome, firefox ইত্যাদি। এই ব্রাউজারে যখন

আমরা কোন ওয়েবসাইটের ‘ডোমেইন নেম’ বা ‘অ্যাড্রেস’ লিখি এবং ‘enter’ করি, তখন এই ব্রাউজার ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্ভারের কাছে একটা অনুরোধ পাঠায়। যখন সার্ভার সেই অনুরোধটি পায়, তখন সার্ভার ওই ওয়েবসাইট সংক্রান্ত যেসব তথ্য এবং ফাইল আছে, সেগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওই ব্রাউজারে ফেরত পাঠায়। এরপর ব্রাউজার সেই তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে। HTML, CSS এবং জাভা স্ক্রিপ্ট কোড বিশ্লেষণ করে আমাদের স্ক্রিনে ওই ওয়েবসাইটের একটি ‘display’ দেখায়। এই পদ্ধতিটিকে আমরা বলি ‘রেন্ডারিং’।

### গুগল কী?

আমাদের কাছে যে স্মার্টফোন আছে, তার ৬০-৭০ শতাংশই হল অ্যান্ড্রয়েড ফোন। প্রায়ই আমরা কিছু জানতে হলে গুগল-এ সার্চ করি। এই গুগলও একটি ওয়েবসাইট। আমাদের স্মার্টফোনের অপারেটিং ব্যবস্থা এমনভাবে করা আছে যে, আমরা যে কোন জিনিস ‘সার্চ’ করতে গেলে গুগল-এর ‘সার্চ বার’-এ কিছু লিখে ‘enter’ করার ২-৩ সেকেন্ডের মধ্যেই গুগল তার ফলাফল দেখিয়ে দেয়। অর্থাৎ আমরা যে জিনিস জানতে চাইছি, সেই সংক্রান্ত যা কিছু তথ্য ওয়েবসাইট আন্তর্জালে আছে, সেই সমস্ত ওয়েবসাইটের তালিকা আমাদের সামনে সাজিয়ে দেয় গুগল।এভাবে গুগল একটি সার্চ ইঞ্জিনের কাজ করে। এই গুগল সার্চ ইঞ্জিন আবিষ্কার প্রযুক্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। যখন থেকে এই সার্চ ইঞ্জিন আরম্ভ হয়েছে, তখন থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার আমাদের কাছে অত্যন্ত সহজ নিত্যপ্রয়োজনীয় একটি ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ গুগল ব্যবহার করলে আমাদের বিভিন্ন ওয়েবসাইটের ‘ডোমেইন নেম’ আর আলাদা করে মনে রাখতে হয় না। পৃথিবীতে কয়েক কোটি ওয়েবসাইট রয়েছে, যার নাম আলাদা করে মনে রাখা বা লিখে রাখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে গুগল।

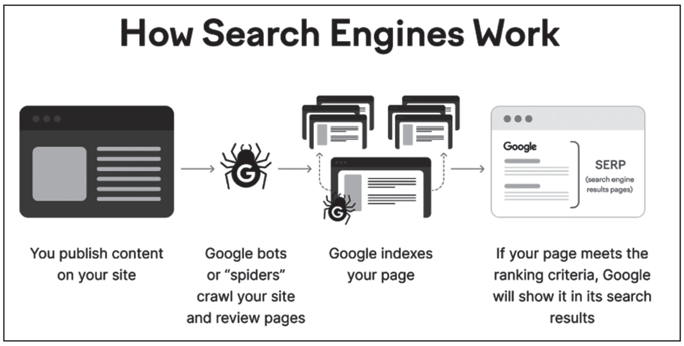


### গুগল কীভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য নিমেষে হাজির করে

এখন গুগল কীভাবে আমাদের কাঙ্খিত বিষয়বস্তুর তালিকা সামনে হাজির করে, সেই বিষয়ে একটু আলোকপাত করা যাক। ধরা যাক, গুগল একটি বিশাল বড় লাইব্রেরি, যার মধ্যে প্রায় পুরো আন্তর্জালটি ঢুকে রয়েছে। এই বড় লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানকে আমরা বলতে পারি ‘গুগল ক্রলার’। গুগল-এ ক্রলার নামক বেশ কিছু কম্পিউটার প্রোগ্রাম থাকে, যেগুলো ইন্টারনেটের মধ্যে থেকে কিছু তথ্য খুঁজে বের করার জন্য ব্যবহৃত হয়। একজন দক্ষ লাইব্রেরিয়ান যেমন অসংখ্য বইয়ের মধ্যে থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় বইটি খুঁজে বার করেন, গুগল ক্রলারের কাজও ঠিক তাই। আধুনিকতম গুগল ক্রলার অ্যালগরিদমটির নাম হলো ‘Google Other’। Google Other এর এই সংস্করণটি এপ্রিল’ ২০২৩ থেকে কাজ করা শুরু করেছে।

এই ক্রলার কীভাবে কাজ করে? প্রত্যেকটি ওয়েবসাইটের মধ্যে কিছু ফাইল থাকে যাকে আমরা বলি robots. txt। গুগল ক্রলার ওই নির্দিষ্ট ফাইলগুলোকে ওয়েবসাইটের মধ্যে খোঁজে। ফাইলগুলোই গুগল ক্রলারকে বলে যে ওয়েবসাইটের কোন অংশটায় প্রবেশ করতে হবে এবং কোন অংশটা এড়িয়ে যেতে হবে। গুগল ক্রলার প্রত্যেকদিন কোটি কোটি ওয়েবসাইট ক্রল করে থাকে এবং কোন ওয়েবসাইট কতজন মানুষ দেখতে চাইছে, সেটি বিবেচনা করে চাহিদা অনুযায়ী ওয়েবসাইটগুলোকে সাজানোর চেষ্টা করে। অর্থাৎ যে ওয়েবসাইট দেখার চাহিদা বেশি, সেটিকে তালিকায় সবার ওপরে রেখে আমাদের সামনে হাজির করে এই গুগল ক্রলার।

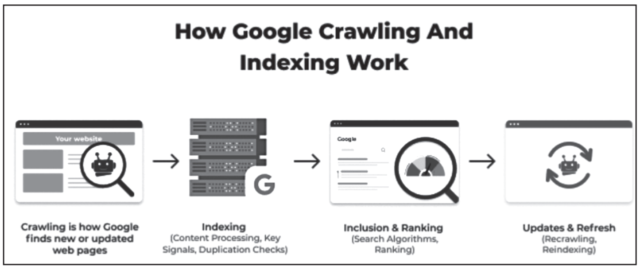


এই সাজানোর ধাপগুলো হল—

১) Natural Language Processing বা NLP। এই NLP-এর সাহায্যে আমরা যে শব্দ লিখে ‘সার্চ’ করি, সেই শব্দ বা সেই শব্দের কাছাকাছি শব্দবন্ধ খোঁজার চেষ্টা করে গুগল।

২) এরপর গুগল চাহিদা অনুযায়ী আমার প্রয়োজনীয় তথ্য একটি তালিকার আকারে প্রকাশ করে, যেটাকে বলা হয় ‘index’। এই index অনেকটা লাইব্রেরিতে থাকা বইয়ের ক্যাটালগের মতো, যেখানে সমস্ত বইয়ের তালিকা থাকে। আমাদের লাইব্রেরিয়ান গুগল ক্রলার এই indexটি খুঁজে দেখে যে, আমরা যে তথ্য চাইছি সেটি index-এ কোথায় আছে বা আদৌ আছে কিনা। এইভাবে গুগল একজন দক্ষ লাইব্রেরিয়ানের মতো আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য কোটি কোটি তথ্যের মধ্যে থেকে খুঁজে বের করে।

### পরিশেষে

এই ধাপগুলোর সাহায্যে আমরা খুব সহজেই যে কোন তথ্য ঘরে বসে হাতের মুঠোয় মিনিটের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি, যা হয়তো অনেক বই পড়েও আমরা জানতে পারতাম না। এভাবেই গুগল আমাদের জীবনযাত্রার ধরনে আমূল পরিবর্তন এনেছে। পরিশেষে গুগল সম্পর্কে একটি উক্তি অবশ্য-প্রযোজ্য— ‘কত অজানারে জানাইলে তুমি’!

### তথ্যসূত্র

1. www.google.com
2. wordpress. com
3. semrush. com
4. sitechecker. com

**লেখিকা ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষিকা, হুগলি বালিকা বঙ্গবিদ্যালয়**

*e-mail: malabikadey29@gmail.com • M. 9432441534*

প্র বী র ব সু

# সাগরতলের সন্ধানে

সমুদ্রের বিশালতায় আর অতলতায় কেমন এক রহস্য রয়েছে যা মনকে মাতাল করে কল্পনাকে উসকে দেয়। সমুদ্রের গভীরের অনেক বিষয় বিজ্ঞানীদের মনে অনেকদিন ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছে কিন্তু কিছু উত্তর পেলেও সমুদ্রের নোনা জলের নীচে গভীর তলদেশের অনেক খবরই আজও অচেনা রয়ে গেছে। সমুদ্র বিজ্ঞান আজও সেভাবে সমৃদ্ধ হয়নি। তবে চেষ্টা চলছে, সমুদ্র বিজ্ঞানীরা অতলান্ত সমুদ্রের এমুড়া-ওমুড়া চষে বেড়াচ্ছেন। ভিন্ন ভিন্ন গভীরতায় জীবনের নানা নিদর্শন খুঁজে বের করার কাজে লেগে রয়েছেন বিজ্ঞানীরা কিন্তু সমুদ্রতল আজও মানুষের কাছে রহস্যাবৃত। সমুদ্রতলের আধারে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে, তা জানতে চান বিজ্ঞানীরা সেই অতলদেশে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের অধীনস্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওশান টেকনোলজি।

ভারত সরকার জানিয়েছে জলযান তৈরি হয়ে গেছে। আগামী অক্টোবরের শেষ বা নভেম্বরের গোড়াতেই তাকে জলে নামিয়ে পরীক্ষা করা হবে। সব ঠিক থাকলে আগামী বছরের শেষেই ভারত মহাসাগরের তলদেশে পাড়ি দিতে পারে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দল।

এ পর্যন্ত চিন, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া মহাসাগরের তলদেশে অভিযান চালিয়েছে। এবার মধ্য-ভারত মহাসাগরে ওই গবেষণায় নামবে ভারত। পৌঁছে যাবে ৬ হাজার মিটার গভীরে। এই অভিযানের জন্য যে জলযান তৈরি করা হয়েছে তার নাম দেওয়া হয়েছে মৎস্য ৬০০০। কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান সচিব এম. রবিচন্দ্রন জানিয়েছেন যে জলযানের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর তাকে জলে নামিয়ে পরীক্ষা করা হবে। চেন্নাই হারবারের কাছে প্রথমে সমুদ্রের ১৫ মিটার গভীরে নামিয়ে পরীক্ষা হবে। সেই পরীক্ষা সফল হলে ধাপে ধাপে আরও গভীরতর এলাকায় নিয়ে পরীক্ষা হবে।

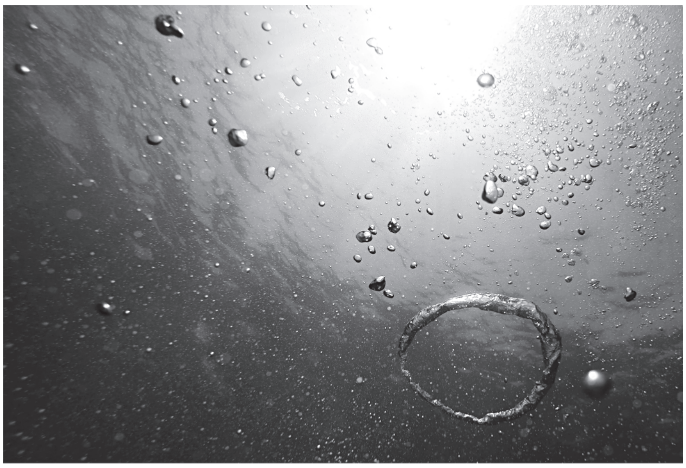

মহাসাগরের তলদেশে জীববৈচিত্র খনিজ সন্ধানের পাশাপাশি পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির অনুসন্ধান এবং জলের লবণ দূর করার ক্ষেত্রেও এই অভিযান দিশা দেখাতে পারবে বলে ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের দাবি।

মানুষ প্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করে ১৯৫৩ সালের মে মাসে। একাধিকবার আরোহন করেছেন এমন শেরপাদের বাদ দিলে এখনও পর্যন্ত এভারেস্টের শৃঙ্গ জয় করেছেন ৫৭৮০ জন পর্বতারোহী। সেই তুলনায় সমুদ্রের গভীরে চ্যালেঞ্জার ডিপে যেতে পেরেছেন মাত্র ৩ জন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে পর্বতারোহনের তুলনায় সমুদ্রের গভীরে যাওয়ার অভিযান এত কম কেন? এর কারণ সমুদ্রকে আমরা পুরোপুরি জেনে উঠতে পারিনি। তাছাড়া সমুদ্রের তলদেশে শত শত ফুট উঁচু জলস্তরের ভয়ঙ্কর চাপ সহ্য করার মতো যথেষ্ট জলযানের অভাব। সমুদ্রের যত গভীরে যাওয়া যায়, জলের চাপ তত বাড়তে থাকে। সমুদ্রের জল লবণ গোলা বলে নদীর মিষ্টি জলের চেয়ে এর চাপ আরও বেশি হয়। এইভাবে চাপ বাড়তে বাড়তে মাত্র ১ মাইল গভীরে এই চাপ বেড়ে দাঁড়ায় প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ২৩ টনেরও বেশি। তাহলে কি ভয়ঙ্কর চাপ সহ্য করে মানুষকে সমুদ্রের তলায় যেতে হয়। তাছাড়া রয়েছে অসাধারণ হিমশীতল জল, আবার সমুদ্রের তলায় রয়েছে নানা হিংস্র প্রাণী।

সমুদ্রের গভীরে গা-গতর-গলা-মাথা ডুবিয়ে দিব্যি নজর এড়িয়ে পাহাড়-পর্বত রয়েছে অনেক। কারও কারও মাথা এত উঁচু যে বাইরে বেরিয়ে থাকে কিছুটা। এরা সি-মাউন্টেনস আর দ্বীপগুলো সমুদ্রদ্বীপ। দশ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে যখন ডাইনোসর দাপিয়ে বেড়াত, তখন সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপগুলি গড়ে ওঠে। আটলান্টিক মহাসাগরে সবচেয়ে বড় পর্বতমালাটি আর্কটিক থেকে আন্টার্টিক অবধি ১৬ হাজার কিমি ছড়ানো ছিটানো।

গভীর সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছলেই তল পাওয়া যায় তবে তা আপাততল। ভূভাগের নদী-নালা সমস্ত আবর্জনা বয়ে এনে সমুদ্রে ফেলে, এছাড়া অগ্ন্যুৎপাতের আবর্জনা, মরুভূমিতে ধুলো-বালি, গ্লেসিয়ারে বয়ে আনা নুড়ি-পাথর বোল্ডার, এমনকি উল্কাখন্ডের সলিল সমাধিও হয় সমুদ্রে। তবে এরাও তুচ্ছ। কোটি কোটি প্রাণীর শক্ত খোসা, ছোট প্রাণীর কঙ্কাল আর বড় প্রাণীর খোলসও জমে সমুদ্রতলে। এভাবে নিরন্তর পলিস্তর তৈরি হচ্ছে। আরও আশ্চর্যের কথা ডায়ামেটস নামের আনুবিক্ষণিক উদ্ভিদ জীবন সমুদ্রে এত ব্যাপক আর বিশাল যে ওদের মোট ওজন সমগ্র ভূখন্ডের উদ্ভিদের চাইতে বেশি। এমন এককোষীদের দেহ নিয়ে সমুদ্রতলে পলির একটা বড় অংশ গড়ে ওঠে।

এছাড়া চমকে দেওয়া চেহারা নিয়ে কতরকমের আজব জীবন সাগর জলে আস্তানা গড়েছে, আকারে এরা আনুবীক্ষণিক থেকে একশো ফুট লম্বা, দেড়শো টন ভারী নীল তিমিও রয়েছে। যেমন স্থলে তেমনি জলেও প্রকৃতির জীবনচক্র চলেছে স্বাভাবিক নিয়মে। ভূভাগে জীবনচক্র চালাতে যেমন সূর্যের আলোয় ফটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়াই সবুজ উদ্ভিদে খাদ্য তৈরি হয়। তেমনি এককোষী ক্লোরোফিলযুক্ত উদ্ভিদ ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন সমুদ্রের চারণভূমি। বিভিন্ন আকার আর আকৃতির প্রাণী জুপ্ল্যাঙ্কটন সমুদ্রে ভেসে বেড়ায় বা সামান্য সাঁতার কাটে। ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন খেয়ে এরা বাঁচে।

সমুদ্র সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তার বেশিরভাগই যন্ত্রযোগে। বাকি সামান্য সরেজমিনে পরীক্ষায়। সমুদ্র বিজ্ঞানীরা এখন অবশ্য উপগ্রহ মারফৎ একাজ অনেক সহজে করছেন।

সমুদ্র নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন সত্যি করার উদ্যমের অভাব ছিল। এখন কিন্তু শিরে সংক্রান্তি, উঠেপড়ে লেগেছেন সকলে। জনসংখ্যা বাড়ছে, পেট চালানো এবং মাথা গোঁজার স্থান অকুলান হচ্ছে। মহাকাশে

নতুন গ্রহের খোঁজ পেলেও পপুলেশন পাচার করা বেশ কঠিন। বরং হাতের কাছে আছে বড় সমুদ্র। এর তলদেশে মহাদেশগুলির চাইতে ঢের বেশি জায়গা রয়েছে। তবে বাসযোগ্য নগর নির্মাণ কঠিন এবং ব্যয়সাপেক্ষ। তবে অসম্ভব নয়। এগ্রিকালচারের ছাঁচে অ্যাকুয়াকালচার করে মাছের উৎপাদন যেমন বাড়ানো যায়, তেমনি সামুদ্রিক জীবনের উৎস প্লাঙ্কটন চাষও যথেষ্ট বাড়ানো যায়। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, সেদিন খুব দূরে নয়, যেদিন পৃথিবীর প্রাণীদের খাদ্য জোগাবে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন আর জুপ্ল্যাঙ্কটন।

সমুদ্রের অতলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে হিরা, সোনা, পেট্রোলিয়াম, কোবাল্ট, লোহা, তামা, নিকেল আর ম্যাঙ্গানিজ। লাখ লাখ বছর ধরে এগুলো জমে আছে। উপযুক্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে এই মূল্যবান খনিজ তুলে আনা সম্ভব।

এভারেস্ট জয়ের শত বছর পরে মানুষ মারিয়ানা ট্রেঞ্চের গভীরতম বিন্দু 'দ্য চ্যালেঞ্জার ডিপ'-এ পৌঁছে নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে। তারপর থেকে ১৯৯৫ সালে জাপানের রোবট এবং ২০০৩ সালে 'নেরেউস' নামে মানুষহীন ডুবোযান ওই গভীরতম বিন্দুতে পাঠানো হয়েছে। ২০১২ সালের পর মানুষ আরও কতকগুলি অভিযানের ব্যবস্থা করেছে। প্রতিটি অভিযানই সফল হয়েছে।

সমুদ্র রহস্যময়, সমুদ্র সুন্দর, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে তার রহস্য উপলব্ধি করতে আমাদেরকে সচেষ্ট হতে হবে। নানারকম উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে সমুদ্রের রহস্য উন্মোচন করে বর্তমান সমস্যা দীর্ণ মানুষের খাদ্য এবং বাসস্থানের মত সমস্যা সমাধানে আমাদেরকে ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

**লেখক জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশকর্মী ও ভ্রমণ বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক**

*e-mail:prabirchandrabasu54@gmail.com • M. 9830676330*

---

**আ বু হা নি ফ শে খ**

# সালফারের চাঁদ

গ্যালিলিও যখন ১৬০৯ সালে দূরবীন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন, তখন তিনি চাঁদের পাহাড় গর্ত, সূর্যের সৌর কঙ্কাল, ছায়াপথ পর্যবেক্ষণ করেন। সেই সঙ্গে ১৬১০ সালের ৭ জানুয়ারি বৃহস্পতি গ্রহকে পর্যবেক্ষণ করলেন। দেখলেন বৃহস্পতি গ্রহের চারপাশে অসংখ্য উপগ্রহ ঘুরছে। তাদের মধ্যে চারটি উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ করে অধ্যায়ন করেন। যেগুলোকে গ্যালিলিয়ান উপগ্রহ বলা হয়। তাই আইয়ো বৃহস্পতির চারটি গ্যালিলিয়ান উপগ্রহ গুলির মধ্যে একটি। সৌরজগতের সমস্ত প্রাকৃতিক উপগ্রহের তুলনায় আইয়োর ঘনত্ব বেশি। এবং জলের পরিমাণ খুব কম।

আইয়ো সৌরজগতের ভূতাত্ত্বিক ভাবে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় বস্তু। তাই এখানে চারশোটিরও বেশি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে। এর বেশ কয়েকটি আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত সালফার ও সালফার ডাইঅক্সাইডের স্তম্ভ পৃষ্ঠ ভাগের ৫০০ কিমি (৩০০ মাইল) পর্যন্ত উত্থিত হয়। আইয়োর পৃষ্ঠভাগে একশোটিরও বেশি পর্বত রয়েছে। যেগুলি আইয়োর সিলিকেট ভূত্বকের তলায় প্রবল চাপের ফলে উত্থিত হয়। এগুলির মধ্যে কয়েকটি পর্বতশৃঙ্গ পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগের সর্বোচ্চ বিন্দু মাউন্ট এভারেস্টের থেকেও উঁচু। প্রোমেথিউস হল আইয়োর একটি আগ্নেয়গিরি নাম। এই উপগ্রহটিতে অসংখ্য অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্ন, বৃহৎ পর্বত আছে। মন্টস মনসও হিমাস মনসহল এর দুটি পর্বত শৃঙ্গের নাম। তবে এর পৃষ্ঠভাগে অভিঘাত খাদের কোন চিহ্ন নেই। উপগ্রহটি মূলত গলিত লৌহ বা আয়রন সালফাইড অন্তস্থল ঘিরে থাকা সিলিকেট পাথর দিয়ে তৈরি। আইয়োর পৃষ্ঠভাগের বেশির ভাগই সালফার ও সালফার ডাই-অক্সাইডের হিমায়িত আবরণে ঢাকা থাকে। তাই আইয়োর পৃষ্ঠভাগটি হলুদ বর্ণ।

আইয়োর অগ্ন্যুৎপাত তার প্রধান ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। এই উপগ্রহটির পৃষ্ঠভাগে আগ্নেয়গিরি, আগ্নেয় গহ্বর ও লাভার প্রবাহ থেকে। যার মধ্যে কয়েকটির দৈর্ঘ্য ৫০০ কিমি। যা উপগ্রহটির পৃষ্ঠভাগে অনেক ভূ-প্রাকৃতিক পরিবর্তন করেছে। আইয়োতে ক্রমাগত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতগুলি বৃহস্পতির শক্তিশালী মহাকর্ষীয় শক্তির ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এবং বিজ্ঞানীদের মতে এখানে বৃহস্পতির শক্তিশালী মহাকর্ষীয় বলের কারণেই লাভার জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়। সালফারের অ্যালোট্রোপ ও যৌগগুলির জন্য পৃষ্ঠভাগটি হলুদ, লাল, সাদা, কালো ও সবুজ রঙের বিভিন্ন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাত্রায় রঞ্জিত করে দিয়েছে। অসংখ্য সুপ্রসারিত লাভা প্রবাহের চিহ্নও পৃষ্ঠভাগে পাওয়া যায়। এই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে বস্তুগুলি উৎক্ষিপ্ত হয়। তা দিয়ে আইয়োর পাতলা, সামঞ্জস্যবিহীন বায়ুমণ্ডল ও বৃহস্পতির সুপ্রসারিত চৌম্বকমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া আইয়োর আগ্নেয় উৎক্ষেপ বৃহস্পতির চারপাশে একটি বৃহৎ প্লাজমা টরাস সৃষ্টি করেছে।

রাতের আকাশে এই উপগ্রহের দিকে টেলিস্কোপ তাক করে পর্যবেক্ষণ করলে। দেখা যাবে, উপগ্রহটি সকালের সূর্যের ন্যায় হলুদ থালার মতো ভেসে আছে। তাই তাকে সূর্যমুখী চাঁদ বলা যায়। এবং তার পৃষ্ঠে সালফারের প্রাচুর্যতার জন্য তাকে সালফারের চাঁদ বলা হয়।

**লেখক বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক**

*e-mail: abuhanifsk1998@gmail.com • M. 8537909601*

ড. সৌমিত্র চৌধুরী

# মহানন্দাকথা

সব মানুষের জীবনেই নাকি একটা নদী থাকে। কারুর মনের মধ্যে গঙ্গা। কারো জীবন ঘিরে আছে তিস্তা। আবার অনেক মানুষের নিজস্ব নদী, মহানন্দা।

সত্যি মহা-আনন্দের নদী ছিল মহানন্দা। জল ছল ছল বিশাল ব্যাপ্তি। অনেক জেলা ডিঙিয়ে, একাধিক রাজ্য পেরিয়ে, ভিন্ন দেশে গিয়ে শেষে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে লম্বা নদীটা।

উৎপত্তি হিমালয় পাহাড়ের দার্জিলিং জেলায়। পাহাড় থেকে নেমে এসে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে মহানন্দা ঢুকেছে বাংলাদেশে। তারপর আবার পশ্চিমবঙ্গ। বিহারের পূর্ণিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদা হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বড় একটা বাঁক নিয়েছে। অতঃপর ভিন্ন দেশে গমন। ঢুকে পড়েছে বাংলাদেশে। তারপর, আরও ২০-২২ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে গোদাগাড়ীর কাছে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে।

শিলিগুড়িতে দূষিত মহানন্দা। ছবির সূত্র : লেখকের ক্যামেরায়, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৯

কতটা দীর্ঘ নদী বুঝতেই পারা যাচ্ছে। হিমালয় থেকে নেমে দু-বার বাংলাদেশ গমন। উত্তরবাংলার অনেক জেলার তৃষ্ণা মিটিয়ে বিহারেও গিয়েছে সে নদী। লম্বা চলন তার। দীর্ঘ আঁকাবাঁকা সে নদীর গতিপথ। বিশাল তার ব্যাপ্তি। লম্বায় ৩৬০ কিলোমিটার। বেশির ভাগটাই, মানে ৩২৪ কিলোমিটার, ভারত ভূখণ্ডে বহমান। দৈর্ঘ্যে শুধু যে বিশাল তাই নয়। প্রস্থেও বেশ বড়। সব নিয়ে নদীর বিশাল ব্যাপ্তি, ২০৬০০ বর্গ কিলোমিটার।

নদীর আকার আর ব্যাপ্তির পরিচয় মেলে ব্রিটিশ আমলের সার্ভেয়ার হান্টার সাহেবের (WW Hunter) লেখনিতে (১৮৭৬)। হান্টার লিখেছেন, 'মহানন্দা অতি বিশাল চওড়া আর খুব গভীর এক নদী। বড় বড় মালবাহী জাহাজ চলত এর বুকে।' কত বড় মালবাহী জাহাজ? '৫০০ মন বোঝা টানবার ক্ষমতা থাকত জাহাজগুলোর।' মানে প্রায় ১৯ টন।

এত বড় নদীর এখন কী হাল? সেই বিশাল নদী এখন শুকিয়ে মৃতপ্রায়। শিলিগুড়ি আর মালদা শহরে নর্দমার মত বইছে অতীতের বেগবতী মহানন্দা।

হান্টারের লেখার একশ বছর পরে ঘটেছে অনেক ঘটনা। ভারত ভেঙে অন্য দেশ তৈরি হয়েছে। কিন্তু নদীর তো ভাগ হয়নি। সে চলেছে আপন মনে। সর্বাঙ্গে দূষণ আর আবর্জনার স্তূপ। নর্দমার মত স্রোতহীন। অতীতের অতি বড় এক নদী এখন একদমই শীর্ণ। শুকিয়ে গিয়ে মৃত্যু শয্যায় ধুঁকছে। বিশাল নদীখাতে চরা পড়েছে। মাঝখান দিয়ে একটেরে সুতোর মত সরু জলধারা।

নদীর পারে, এপার ওপার জুড়ে মানুষের বসবাস। এমনকি নদীর চরেও জীবন যাপন। ফলত, মানুষ গরু শুয়োর কুকুরের বর্জ্য সরাসরি নদীতে গিয়ে মিশছে। এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে অন্য দূষিত পদার্থ। শহরের নিকাশিনালা থেকে যাবতীয় আবর্জনা বেরিয়ে এসে প্রতিনিয়ত নদীতে জমা হচ্ছে। সব মিলিয়ে মহানন্দা নদী এখন নালার নামান্তর।

অথচ ১৯৬০-৭০ সালেও বেশ চওড়া নদী ছিল। বর্ষাকালে নদীর বুকের প্রবল জলরাশি মালদা শহরে উঠে আসত। শুধু বর্ষায় নয়, শীতকালেও প্রচুর জল থাকত নদীতে। নৌকা করে মহানন্দা পেরিয়ে 'মালদা কোর্ট স্টেশন'-এ গিয়ে ট্রেন ধরতে হত। তখন ষ্টেশন বলতে ছিল 'কোর্ট স্টেশন'। ১৯৬৪-৬৫ সালে মহানন্দার বুকে পিলার তুলে তৈরি হল ব্রিজ। সেই ব্রিজ পেরিয়ে মালদা থেকে ওল্ড মালদা পৌঁছান সহজ হল। পাকা পুল তৈরি হল বটে কিন্তু তার ফলে চরা পড়তে লাগলো মহানন্দার গভীর বুকে। নদী খাত ভরে উঠতে লাগল।

ব্রিজ তৈরির আগে দুটো মাটির বাঁধ তৈরি হয়েছে শহরে। বর্ষাকালে নদীর জল আটকে শহরটাকে (ইংরেজবাজার) বাঁচানোর উদ্দেশ্যে। শহর বেঁচেছে কিন্তু নদী শুকিয়ে মরতে বসেছে।

একাত্তর সালেও শিলিগুড়ি শহরে দেখেছি মহানন্দা। বেশ চওড়া, বেগবতী এক নদী। নদীর বুকে একটা সেতু ছিল তখন। সেই মহানন্দা সেতু পেরিয়ে ঢুকতে হত শিলিগুড়ির হিল কার্ট রোডে। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটল। যান চলাচলে গতি আনতে আরও একটা ব্রিজ তৈরি করা হল বর্তমান ব্রিজের পাশেই। ফলত, মহানন্দা শুকিয়ে কাঠি হয়ে যেতে আরম্ভ করল। শিলিগুড়ির মহানন্দায় এখন পা ডোবে না।

আর মলদায় নদী খাতের যে স্বল্প স্থানে সামান্য জল থাকে, সেখানে কোমর ডোবে না। হেঁটে নদী পারাপার করা যায়।

অথচ ত্রিশ বছর আগেও মালদার মহানন্দায় মালবাহী নৌকা চলত। হবিবপুর থেকে বুলবুলি হয়ে মহানন্দার বুকে নদী পথ দিয়ে ধান ঢুকত শহরে।

সে সব এখন গল্পকথা। পঞ্চাশ বছরে নদীটা ধুঁকতে ধুঁকতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিৎ, উত্তরবাংলার দুই ডজন নদী সম্পূর্ণই হারিয়ে গেছে।

এখন কেমন আছে মহানন্দা? এককথায়, মৃতপ্রায়। শীর্ণ জলের ধারা বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে নিঃশব্দে নীরবে।

কেন এমন হল? উত্তরে বলতে হয় অনেক কথা। প্রধানত সরকারি

স্তরে অবহেলা ও দুর্নীতি। ব্যক্তিগত স্তরে মানুষের উদাসীনতা। আরেকটি বড় কারণ, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও অপরিকল্পিত নগরায়ন। ১৯৩১ থেকে ১৯৪১, এই সময়কালে জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি হয়েছে শিলিগুড়ি শহরে। পরবর্তী দশকে (১৯৪১-১৯৫১) জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে আগের দশকের তুলনায় ২১৯ শতাংশ বেশি।

জনবিস্ফোরণের চাপে বসতি বেড়েছে অতি দ্রুত। পরিকল্পনার অভাব হেতু শহরের যাবতীয় নালা-নর্দমার জল সরাসরি নদীতে গিয়ে মিশেছে। ঘটেছে নদীর দূষণ।

দূষণ মুক্তির কথা ভাবাও হয়েছে। সরকারি সূত্র অনুযায়ী, ২০০২ সালে মহানন্দা ও শিলিগুড়ি শহরের আরও দু'টো নদীর (জোড়াপানি-ফুলেশ্বরীর) দূষণ রোধের উদ্দেশে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। শহরের নিকাশি আবর্জনা পরিশোধন করে মহানন্দা-জোড়াপানি-ফুলেশ্বরী নদীতে ফেলবার উদ্যোগ শুরু হয়। তিনটি 'স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট' (এসটিপি) তৈরির প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে পেশ করে রাজ্য সরকার। প্রস্তাব মেনে নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। বরাদ্দ করে ৩৭ কোটি টাকা। প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব পায় শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এসজেডিএ)।

কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ মিললেও নদী সংরক্ষণের কাজ বাস্তবত শূন্য। এসটিপি তৈরির জমি, পাইপ বসানোর জায়গা মিলতে বছর গড়িয়ে যায়। ২০০৬ সালে দুটি এসটিপির জন্য প্রয়োজনীয় জমি হাতে আসে। জোড়াপানি ও ফুলেশ্বরীর জল পরিশোধনের জন্য ডাবগ্রামে এসটিপি তৈরি হয়। উদ্দেশ্য কী ছিল? শহরের যাবতীয় দূষিত নোংরা জল কয়েক দফায় পরিশ্রুত করা হবে। প্রথমে ডাবের খোলা, প্লাস্টিক, থার্মোকল জাতীয় আবর্জনা ছেঁকে ফেলা। দ্বিতীয় দফায় জল পরিশ্রুত করে জীবাণু মুক্ত করা হবে। তৃতীয় দফায় অর্থাৎ পরিশোধনের পরে দূষণ মুক্ত জল পাম্প করে ফেলা হবে নদীতে। ফলে, নদীর বুকে শহরের জঞ্জাল-আবর্জনা মিশবে না। আবর্জনায় ভরে উঠবে না নদীখাত। দূষণ মুক্ত নদী তৈরি হবে।

কিছু কাজ হয়েছে ঠিকই। দুটি এসটিপি-র সিংহভাগ কাজ হয়ে যায় দ্রুত (২০০৯-২০১০ সালের মধ্যে)। কিন্তু পাম্প বসানোর কাজই সম্পূর্ণ হয়নি তখন। ২০১১ সালে এসটিপি দুটি চালু করার ব্যাপারে তোড়জোড় শুরু হয়। কিন্তু কাজ তেমন এগোয়নি। ২০১২-১৩ সালের মধ্যে এসজেডিএ-র বহু অর্থ (অন্তত ৬০ কোটি টাকা) তছরুপ হয়। সংবাদ পত্রের খবর অনুযায়ী, বিষয়টি আদালত অবধি গড়ায়। অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগে গ্রেফতার হন প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা মালদহের তৎকালীন জেলাশাসক।

দুর্নীতি-মামলার ধাক্কায় শিলিগুড়িতে নদী দূষণ মুক্তির যাবতীয় আয়োজন জলে যেতে বসেছে। নদীকে দূষণ মুক্ত করবার কাজ না-এগোলেও অন্য কাজ হয়েছে। জোড়াপানি নদীর মাটি কাটার কাজে বহু কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট দফতরের বিরুদ্ধে।

শিলিগুড়ি ও মালদা শহরে মহানন্দা নদীর দূষণ দূর করবার কাজ কার্যত শিকেয়। স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী ও বিজ্ঞান কর্মীদের তরফে এমনই অভিযোগ উঠেছে বারবার।

শিলিগুড়ি শহরে মহানন্দা (ও আরও দুটো নদী) দূষণ মুক্ত করবার মত অর্থের যোগান ছিল ভাণ্ডারে। এসজেডিএ-এর নিজস্ব তহবিলে গচ্ছিত ১৬০ কোটি টাকা থেকে কয়েক কোটি মাত্র খরচ করলেই দুটি এসটিপি চালু করা সম্ভব হতো। সে সব হয়নি। শিলিগুড়ির স্থানীয় মানুষের অভিযোগ এবং পত্র-পত্রিকার সংবাদের নির্যাস : এসজেডিএ-এর টাকায় শহরে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। খরচ হয়েছে বহু কোটি টাকা। একাধিক শ্মশান তৈরির নামে বহু অর্থ নয়ছয় হয়েছে। কোটি টাকা খরচ করে ত্রিফলা আলো বসানো হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে অনেক। আদালতের রায়ে ৩ জন ইঞ্জিনিয়র, ৭ জন ঠিকাদারকে জেলে যেতে হয়েছে। এখন সিসি ক্যামেরা অধিকাংশই অকেজো। ত্রিফলা বাতি স্তম্ভে আলোও জ্বলে না অনেক জায়গায়।

তাই শিলিগুড়ির নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এখন দাবি উঠেছে, দ্রুত এসজেডিএ-এর দুর্নীতি মামলায় নয়ছয় হওয়া টাকা উদ্ধার করতে হবে। শহরের নদী দূষণের জন্য তৈরি এসটিপি প্রকল্প চালু করা হোক। নাগরিক সমিতির অভিমত, 'শহরবাসীদেরই রাস্তায় নেমে মহানন্দা সহ সব কটি নদীকে বাঁচাতে জোট বাঁধতে হবে।'

মালদার মহানন্দা। তার অবস্থাও শিলিগুড়ির অংশের মত। নর্দমার জল শোধন করে মহানন্দা নদীতে ফেলবার পরিকল্পনা ছিল স্থানীয় মিউনিসিপালিটির। অনেক গুলো জায়গায় নর্দমার জল শোধনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কোথাও কোন দূষিত জল পরিশোধনের (ট্রিটমেন্টের) চিহ্ন চোখে পড়ল না। অথচ চার-পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে অর্থাৎ জাতীয় সড়ক এন এইচ ৩১ থেকে সুস্থানি মোড় পর্যন্ত, চারটি বাঁধ তৈরি হয়েছে। দশ-পনের বছরের মধ্যে তিনটে বাঁধ মহানন্দা নদীর বুকে!

মহানন্দার বুকে বাঁধগুলো তৈরি হবার ফলে সড়ক পথে যানবাহন চলাচলে গতি বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু নদীর অবস্থা?

দূষণে জর্জর নদীর কথা ভাবছেন না প্রশাসন। দূষণ নিয়ন্ত্রনে আদৌ উৎসাহী নয় তারা। উদাসীন সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। মালদা শহরে জলের বিশাল ভাণ্ডার বয়ে নিয়ে যাওয়া বৃহৎ নদী সবার চোখের সামনে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

উত্তরবঙ্গের ডজন দুয়েক নদীর মৃত্যু ঘটেছে। বহু নদীর অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। তেমনই কি ঘটবে মহানন্দার ক্ষেত্রে?

ভারতে জলের ওভাবে ধুঁকছে বড় বড় শহর। চেন্নাই ব্যাঙ্গালোর জল বিহীন। মুম্বাই দিল্লি সহ ভারতের ১২ টি শহরে তীব্র জলাভাব। জল কষ্টে ভুগছেন দেশের ১০ কোটি মানুষ। জলসঙ্কটে ব্যাহত হচ্ছে কৃষি কাজ। অনিবার্য পরিণতি খাদ্য সঙ্কট।

নদী, খাল, বিলে ভর্তি বাংলা ভূখণ্ডে জলের তীব্র অভাব সৃষ্টি হয়নি এখনও। তবে যে ভাবে নদী দূষণ এবং নদীর বিলুপ্তি ঘটছে তাতে কয়েক বছরেরে মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটিও জলের ওভাবে নিজের মৃত্যু ডেকে আনবে। সব মিলিয়ে পরিস্থিত অতীব সংকটময়। এখনই সতর্ক, সজাগ এবং সচেতন না হলে বিপদ অনিবার্য।

---

**লেখক ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান ও এমেরিটাস মেডিক্যাল স্যায়েন্টিস্ট, চিত্তরঞ্জন জাতীয় কর্কট রোগ গবেষণা সংস্থান, কলকাতা**

*e-mail: soumitrag10@gmail.com • M. 9831046252*

ড. অসিত ঘোষ

# ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক আলোক দিবস-২০২৪

*১৬.০৫.২০২৪ তারিখ জাহির সায়েন্স ফাউন্ডেশন-এর নয়াদিল্লি কার্যালয়ে ইউনেস্কো বিশ্ব আলোক দিবস পালিত হয়েছিল। লেসার রশ্মি আবিষ্কারের ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে ইউনেস্কো এই দিনটিকে বিশ্ব আলোক দিবস চিহ্নিত করেছে। ইউনেস্কোর উদ্যোগে এই দিনটিকে স্মরণ করে ফি-বছর দেশে-দেশে উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। সাধারণত, জাহির সায়েন্স ফাউন্ডেশন ও বিশ্ব শান্তি সংস্থা যৌথ উদ্যোগে এ-বছরে অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিল। ১৯৭০ সালে স্থাপিত, প্রয়াত বিজ্ঞানী এস. হোসেন জাহির-এর নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যে অবদান রেখে চলেছে, তা অনবদ্য। অংশবিশেষও এখানে আলোচনার পরিসর নেই; ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক আলোক বর্ষ তামাম বিশ্বের দেশগুলিতে সাড়া জাগানো মহতী কার্যসূচি বর্ষব্যাপী পালিত হয়েছিল। আমাদের দেশের হায়দ্রাবাদে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তরের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সেগুলির অনুমোদিত কলেজসমূহে ঘোষিত প্রোগ্রাম সাফল্যের সাথে পালিত হয়েছিল। প্রধানত ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে যথেষ্ট সাড়া জেগেছিল। অংশগ্রহণকারী দেশেগুলির সাফল্য ও উৎসাহ দেখে ইউনেস্কো সেপ্টেম্বর ১৯, ২০১৬ সিদ্ধান্ত নেয়, প্রতি বছর মে ১৬ দিনটি, আন্তর্জাতিক আলোক দিবস হিসেবে পালন করা হোক। ইউনেস্কোর সদস্য-দেশগুলো এই মর্মে সম্মতি জানালে ২০১৮ সাল থেকে দিনটি ফি-বছর পালিত হবে, ঘোষিত হয়। এ-বছরেও নির্দিষ্ট দিনটি ইউনেস্কোর নির্ঘন্ট মেনে উল্লিখিত সংস্থায় দিনটি উদ্‌যাপন হয়েছিল।*

আন্তর্জাতিক আলোক দিবস সম্পর্কিত বিশ্ব সংস্থার প্রকাশিত প্রতীক বিশিষ্ট পদার্থবিদ ও প্রযুক্তিবিদ 'থেয়োডোর মৈমান' লেজার রশ্মি আবিষ্কারের পর আলোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মাইলফলক সৃষ্টি হয়েছিল। বিশ্বকে বদলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মৈমান-এর প্রতিভা, বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সাথে সুস্থিতি উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। থেয়োডোর কীর্তি স্মরণীয় রাখতে তাই প্রতি বছর দিনটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়, ইতিমধ্যে উল্লেখপর্বে বলা হয়েছে।

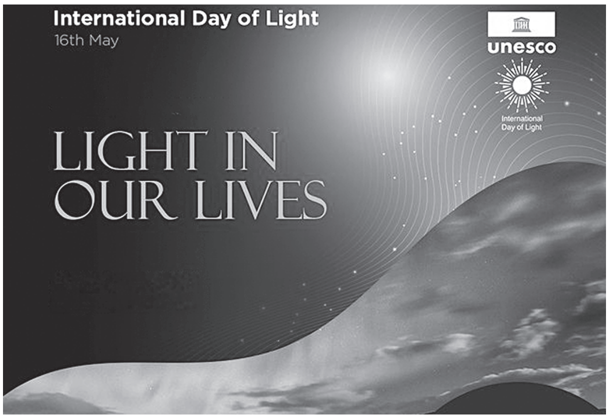


এই পরিসরে এবার, আলোক বিজ্ঞানের অগ্রগতি কিভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করছে অংশবিশেষ হলেও আলোচনা করা দরকার। আলোর অনেক ব্যবহারিক দিক আমাদের কাছে আশ্চর্যজনকভাবে উদ্ভাসিত, আবার অনেক কিছু এখনো অজানায় তমসাচ্ছন্ন। বিজ্ঞানের এই বিষয়ে লাগাতার প্রচেষ্টায় অগ্রগতির ফলে মানবসমাজ লাভবান হচ্ছে। আবার কেবলই বিজ্ঞান কেন— শিল্পকলা, সংস্কৃতি, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন তা চিকিৎসাক্ষেত্রে, শল্যবিদ্যায়, ওষুধশিল্পে এবং সর্বোপরি যোগাযোগ ব্যবসায় ব্যবহারিক প্রয়োজনে, আলোর অনন্য গুরুত্ব আরোপিত হচ্ছে। ইউনেস্কোর ভাবনায় সমাজে শান্তিপূর্ণ অগ্রগতিতে তামাম বিশ্বে উন্নয়নের কাজে সহায়তা দান করাই বিজ্ঞানীদের বিশেষত আলোর গবেষণায় অগ্রগতিই লক্ষ। বিস্তারিতভাবে বলার তেমন অবকাশ এখানে নেই, তবুও উল্লেখের গুরুত্ব রয়েছে— বিভিন্ন প্রকার জৈবভর শক্তির উৎস, বিভিন্ন পচনশীল পৌরবর্জ্য ও শিল্পজাত বর্জ্য অর্থাৎ কঠিন পচনশীল বর্জ্য পদার্থ (Solid Bio-degradable waste), গবাদি পশুর খামারের বর্জ্য, পতিত জমিতে শুষ্ক ও ভিজে আস্তানার জঞ্জাল থেকে সৃষ্টি মিথেন, আলোক শক্তির উৎস যা নির্দিষ্ট চাপে ও তাপে একপ্রকার জ্বালানিতে রূপান্তর হয়ে জৈব ভরশক্তি পাওয়া যায়। অণুজীবকৃত উৎপাদিত হাইড্রোজেন, সন্ধান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত মিথেন বা বায়োগ্যাস, শক্তি উৎপাদনকারী উদ্ভিদের বনসৃজনে, ইথানল এবং বায়োডিজেল, শৈবাল ও ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রস্তুতকৃত হাইড্রোজেন (Third Generation Bio-fuel) যৌগ বা গ্যাস হাইড্রেট প্রস্তুত যা ভবিষ্যতের প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প হিসেবে বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। সাম্প্রতিক কালে, সৌর শক্তি অবলম্বনে নীলাভ শৈবাল nitrogenase-র কার্যকারিতায়, হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদনে শৈবালের ক্লোরোফিলযুক্ত দেহকোষে হাইড্রোজেন গ্যাসের আলোক উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। ফলে, ভবিষ্যতে এই ধরনের আলোকক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাসকে দূষণহীন জ্বালানি রূপে ব্যবহারের সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে।

আলোর প্রযুক্তি নিয়ে কিছুমাত্র আলোচনা এখানে এবার আনতে হয়। বিশেষ করে ফাইবার অপটিক্স বা ইলেকট্রোনিকস প্রযুক্তির প্রভাবে সমগ্র পৃথিবীকে বিশ্বগ্রামে পরিণত করে দিয়েছে। যোগাযোগ ব্যবসা, চিকিৎসায় বিশেষত, দন্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে এবং প্রেক্ষাগৃহে সাংস্কৃতিক শিল্পকর্ম-র জীবন্ত প্রদর্শনী মনোগ্রাহী করে তুলতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার অনস্বীকার্য। ক্যামেরা যুক্ত ইলেকট্রণ অণুবীক্ষণযন্ত্র দন্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য, গৃহ অভ্যন্তরীণ সাজসরঞ্জাম নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে, বায়ুর চাপ, দিনের তাপমাত্রা তারতম্যের ক্ষেত্রে ও বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিমাপে সেন্সর প্রযুক্তি (বিজ্ঞানী ব্রসলে ও অন্যান্য, ১৯৯৭) প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সিনেমা ও নাট্যমঞ্চে মণ্ডপসজ্জায় আলোর ফুলকি সঞ্চালনের ক্ষেত্রে Opto-electronics-এর ব্যবহার বহুতর রয়েছে (যা অন্য পরিসরে আলোচনা হতে পারে)। রিমোট সিগন্যাল প্রয়োগ প্রণালীতে আলোকরশ্মির নির্দিষ্ট বর্ণ পরিবর্তনে (লাল,হলুদ বা সবুজ ইত্যাদি)-র সাহায্যে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে, কোন সেতুর নিচের জলতরঙ্গ (বিশেষত সিনেমা শিল্পে জীবন্ত ছবি রূপদানে) সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে, ঝর্ণা, জলপ্রপাত ও আকাশযান উত্তরণ বা অবতরণ করার সময় প্রকৌশলটি ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটে। বিজ্ঞানী আয়ার ও কার্টার (১৯৯৫) এইসব বিষয়ের কার্যকরণ সম্পর্কে দু-ধরনের ব্যবস্থাপনায় বেঁধেছিলেন।

i) ফাইবার আলোকবিজ্ঞান কৌশল;

ii) প্রিজম দিয়ে আলোর প্রতিসরণের পার্শ্বক্রিয়া।

ফিল্ম-কাঁচ বা প্লাস্টিক ফাইবারের বর্ণালীযুক্ত পাতলা আস্তরণ আলোক উৎসের সামনে ধরলে নানান বর্ণময়তা দেখানো যায়। রঙ্গমঞ্চের কারিগরীবিদ্‌রা আলোর প্রসারণের ঘনত্বের সাথে ফ্লোর এরিয়ার ব্যবধানে সাযুজ্য রেখে আলোর উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে কমিয়ে বস্তুকে দৃশ্যমান ও আলোকময় করে তোলে।

**প্রিজমের সাহায্যে বর্ণময় আলোর গঠন :** অফিস কাছারিতে, বড়

শপিং মলে, রেস্তোরায় প্রভৃতিতে এ-ধরনের ব্যবসা করা হয়ে থাকে। আতস কাঁচ বা রঙিন কাঁচ প্রিজমাকৃতির প্রতিসারকের সাথে বা উজ্জ্বল আলোক উৎসে ব্যবহারের ফলে লাল বা অতিবেগুনী রশ্মি সৃষ্টি হয়ে থাকে। ১০-২৫ সেমি. ব্যাসবিশিষ্ট আলোর উৎসের উন্মেষে (apparture) উল্লিখিত ব্যবসায় দৃশ্যমান বস্তুকে ফুটিয়ে তোলে। উপরের আলোচনায় সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে, আধুনিক বিশ্বব্যবসায় প্রযুক্তি রসায়নের বিপ্লবে লাইটিং সিস্টেম আজ কোথায় পৌঁছেছে যেখানে কৃত্রিম আলোক ব্যবসার উন্নতিতে মানুষের জীবনযাত্রা গতিময় হয়ে উঠেছে। মোটের উপর, বিংশ শতকে বিশ্ব যেমন ইলেকট্রনিক্সের উপর নির্ভরশীল ছিল, একবিংশ শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতে ফোটেনিক্স যেন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী চার্লস কাওয়ের হাত ধরে আধুনিক বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি ও সংযোগের কারিগর আলোক তন্তু বা অপটিক্যাল ফাইবার উদ্ভাবন ঘটেছিল। তাহলে নতুন টেকনোলজিটি সহজেই সংজ্ঞায়িত করা যায়, এইভাবে আলোকতন্তু হল আলোক সংকেত পরিবহনে উপযোগী অতি সূক্ষ্ম, হালকা অথচ টেকসই তার যা আসলে আলোর অনাহিত কণা বিশেষ। আর এই অনাহিত কণাই গড়ে তুলেছে ফোটোনিক্স (গ্রীক শব্দ 'ফোটন' থেকে ফোটোনিক্স বা আলো সম্পর্কিত বিশদ গবেষণা)-এর সাফল্যের মাপকাঠি। এখানে সিগন্যাল কনফিউশন ও নয়েজের উপস্থিতি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। ইলেকট্রনের তুলনায় ফোটন হাজার গুণ দ্রুততায় বাহিত হয় এবং নয়েজও এড়ানো গেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্মার্টফোন থেকে ল্যাপটপ, ইন্টারনেট, রঙিন আলোর ব্যবহার বা চিকিৎসা বিজ্ঞানে ফোটোনিক্সের ব্যবহারে সার্থক প্রয়োগ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আলোর তরঙ্গ ও কণা ধর্মকে (আলোর দ্বৈত সত্তা, বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ও মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ফোটোইলেকট্রিক প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণা) কাজে লাগিয়ে বহু দুরারোগ্য রোগের মোকাবিলা করা অথবা অপরাধ জগতের বহু জটিল সমস্যা সমাধান সম্ভব হয়েছে। আজকাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে ফোটোনিক্সের ব্যবহার অপরিহার্য আগেই বলেছি। এখানে উল্লেখপর্বের সাথে যোগ করা আবশ্যিক, হৃদরোগীদের পেসমেকার বসানোর ক্ষেত্রে, সিন্থেটিক হাড় প্রতিস্থাপন, এন্ডোস্কোপি ও ল্যাপরোস্কপিতে ব্যবহৃত মাইক্রোক্যামেরাতেও বায়োফোটোনিক্সের পরিশীলিত প্রয়োগ রয়েছে। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গ্রিনহাউস গ্যাস (GHG) বা কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমানো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘ একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা আমাদের জানা আছে। নির্দেশ আছে যে সব সদস্য-দেশ দ্রুত সিদ্ধান্তের পরিবর্তে গড়িমসি দেখাবে সেক্ষেত্রেও বিধান (Poluters shall pay ) গৃহীত হয়েছে।একটা বিষয়ে পরিসংখ্যান দিচ্ছি; বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ খরচ ১৯ শতাংশ কেবল আলো জ্বালানোর জন্যে ব্যয়িত হয়। পরিসংখান বলছে, একটি ইলেকট্রিক বাল্বের পরিবর্তে সলিড স্টেট লাইটিং (SSL)-এর ব্যবহারে অন্তত ৯০ শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে খরচের লাগাম টানা যাবে। এছাড়াও সেন্সর প্রযুক্তিতে, বায়োমেট্রিক ব্যবসায়, ভিডিও নজরদারিতে এবং সীমান্ত সুরক্ষার ক্ষেত্রে ফাইবার আলোক তন্তু প্রযুক্তি বহুল ব্যবহার আত্মপ্রকাশ করেছে। কৃত্রিম উপায়ে Cloud Busting এবং Cloud Cladding করিয়ে বৃষ্টিপাত ঘটানো, আলোক রসায়ন বিক্রিয়ার মাহাত্ম্যের (Photosensitization) মতো বিরল ঘটনার আশু পরীক্ষা নিরীক্ষা নিরন্তর চলছে।

সব মিলিয়ে আজকের দিনে স্বল্প খরচে উন্নতমানের আলোক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নততর ক্রম বিকাশকে মান্যতা দেওয়ার তাগিদেই ইউনেস্কো পৃথিবীর সদস্য দেশগুলোতে লেসারের (Light amplication by stimulated emission of Radiation) আবিষ্কারের ঘটনাকে স্মরণীয় রাখতে দিনটি বিশেষভাবে পালিত হয়ে আসছে।

**লেখক অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক**

*e-mail:a.ghosh1@yahoo.co.in • M. 8961228439*

## চিঠি

সুধী,

বাংলা বানান পদ্ধতি অনুসরণ করে বিজ্ঞান শব্দের ইংরেজিতে রূপান্তর হওয়ার কথা : bijnan এবং অন্বেষক হতে পারত : anwesak. এই বিষয়ে আমি মাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

ভাইরাস নিয়ে পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে খেতে একটি সরল তত্ত্বের কথা মনে এল। তা হল,ভাইরাস অণুজীব লক্ষগুণ ক্ষুদ্র-অণু যে নামেই চিনতে চাই, তারা সকলেই প্রাণিকোশ। অম্ল বা অ্যাসিড পরিবেশ বা আবাস না পেলে তারা জারিত হয়ে বৃদ্ধির সুযোগ পায় না। তাহলে মানবশরীরে বা জীবশরীরে ঐ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুজীব বা প্রাণিকোশ জীবনকাল বা আয়ু উত্তীর্ণ হয়ে ঘন্টা-দিন-সপ্তাহ-মাস পার হয়ে নিষ্কাশিত হয়ে মূত্র-থুথু-ঘাম-শ্লেষ্মা প্রবাহিত হয়ে নির্গত হবে প্রকৃতির নিয়মে। তাহলে ঐ অম্ল-আবাস যদি বন্ধ করি তো, ঐ জারণ বা বৃদ্ধি কিছুই সম্ভব হবে না।এখন অম্লের প্রতিপক্ষ বা বিপরীতে কে বা কারা? ক্ষারকে তো চিনি, অ্যালকালি নামে। তা হলে,অম্লকে জব্দ করতে ক্ষারকে ডাকি না কেন? ডাকি না,কারণ ডাকতে চাই না!

একটু ভেঙে বলি— জৈব উপাদানকে বস্তুগত ভাবে ভাগ করা গেছে। পিএইচ মাত্রা সাত থেকে এক হলে, তাকে অম্ল আখ্যা দিয়েছি। আর, সাত থেকে চোদ্দ হলে তাকে ক্ষার নামে চিনি। এই সাত চোদ্দ-র মধ্যম অবস্থান 'সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে সাত'। এটি এক নিয়ামক ব্যবস্থা। নিয়ন্ত্রক। এই সহজ ব্যাপার গ্রহণ করি না কেন?

কেন, তার কারণ, কোশের নির্মাণ সামগ্রীতে, বিল্ডিং ব্লক হিসাবে প্রোটিনকে মান্যতা প্রদত্ত। তাই খাও মাছ-মাংস-ডিম: তবেই বৃদ্ধি নিশ্চিত। কিন্তু ভুলে যাই, ঐসব 'প্রোটিন' তৈরি হয়ে থাকে উদ্ভিজ্জ খাদ্যবস্তু থেকে। মাংস-ডিম-মাছে যে প্রোটিন তা অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে জর্জরিত-তার পি-এইচ মাত্রা সাত থেকে একের মধ্যে। ফলে অম্লতার আধিক্য। ভুলে যাই উদ্ভিজ্জ খাদ্যেও প্রোটিন আছে— তাদের পি-এইচ মাত্রা সাত থেকে চোদ্দ অর্থাৎ ক্ষার বা অ্যালকালি। বিশ্বে এই উদ্ভিজ্জ খাদ্যের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে, বেড়ে চলেছে : এদের বলা হয় ভেগান বা নিরামিষ ভোজী। এই খাদ্যাভ্যাস যারা অনুসরণ করে তাদের 'ওকিনাওয়া' পথিক বলা যেতে পারে। আরও এক সহজ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলে শেষ করি এই জটিল সমস্যার।

তা হল, চুন, পাথুরে চুন বা চুনের জল। জলাধার বা জলাশয়কে মৎস্যবন্ধু বানাতে চূণ দেওয়ার রেওয়াজ। মানুষকে রোগ মুক্ত রাখতে 'চুনের জল' নিয়মিত খাওয়া যেতে পারে— চুনের জলের 'পি-এইচ' মাত্রা বারো দশমিক পাঁচ। দৈনিক কুড়ি মিলি এক নিরাপদ মাত্রা। ফলে ভাইরাসদের ক্ষতি করার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

বিনীত

রণজিৎ পাল, কলকাতা • *M. 98312066546*

ড. দীপাঞ্জন দে

# রেখা দাঁ ও বিজ্ঞান আন্দোলন

একজন নিরলস নেপথ্য-বিজ্ঞানকর্মী বলতে যা বোঝায়, রেখা দাঁ ছিলেন ঠিক তেমনই। নীরবে নিভৃতে জীবনভর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকে সমাজ চেতনা, বিজ্ঞান চেতনার প্রসারে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়া একজন বিজ্ঞান শিক্ষিকা ছিলেন তিনি। খুব বেশি চর্চার আলোকে না এলেও জীবনভর তিনি যে সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, লেখালেখি, সংগঠন করে গিয়েছেন এবং সেই সকল কাজকর্মের ফলে সমাজ যেভাবে ক্রমান্বয়ে উপকৃত হয়েছে, সেই দলিল আজ রীতিমত চর্চার দাবি রাখে। রেখা দাঁয়ের মতো নেপথ্যকর্মীর রেখে যাওয়া মশাল ধারণ করে বর্তমান প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের সমাজকর্মী, বিজ্ঞানকর্মীরা কতদূর বয়ে নিয়ে যেতে পারেন এবং কিভাবে পারেন, সেটিই হবে দেখার। রেখা দাঁ তাঁর একাত্তর বছরের জীবনকালে (১৯৫৩-২০২৪) যে ধরণের বহুবিধ কাজকর্মে শরিক হয়েছিলেন, হিতবাদী চিন্তা-ভাবনা, পরিপূর্ণ জীবনবোধ না থাকলে সেগুলি সম্ভব হতো না।

উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙাকে ভরকেন্দ্র করে বিজ্ঞানকর্মী রেখা দাঁয়ের বহুবিধ কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটেছিল। নিজের বিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ছাত্রী রেখা দাঁ বিদ্যালয়ে পাঠকালেই বিশিষ্ট বিজ্ঞান-প্রচারক মণি দাশগুপ্তর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। মণি দাশগুপ্তের ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনা, বিজ্ঞানমনস্কতা, আদর্শবোধ দ্বারা রেখা দাঁ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে মণি দাশগুপ্তের নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালে গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হলে রেখা দাঁ-ও ওতপ্রোতভাবে সেই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৭৬ সালে তিনি এম.এসসি. পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে 'খাঁটুরা প্রীতিলতা শিক্ষা নিকেতন' বালিকা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত হন। গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত থাকার সূত্র ধরেই রেখা দাঁ বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে যান। আর বিজ্ঞান আন্দোলন করতে গিয়েই ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গী দীপককুমার দাঁ-র সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট পরিচালিত গ্রীষ্মকালীন বিজ্ঞান শিবিরে রেখা দাঁ শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিতেন। ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদ থেকে শুরু করে মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার, হারবেরিয়াম শীট তৈরি, লিফ জু তৈরি, সোলার কুকারে রন্ধন পদ্ধতি, পারিপার্শ্বিক ঔষধি গাছ চেনানো, জীববৈচিত্র্য নথিবদ্ধকরণ প্রভৃতি শেখানোর মধ্যে দিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের পছন্দের প্রশিক্ষক হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৭৮ সালে গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট থেকে রেখা দাঁ পাঁচ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে দিল্লিতে যান সারা ভারত শিশু বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে যোগদান করতে। ২০০৪ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন। হাতে-কলমে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সায়েন্স হবি সেন্টার পরিচালনায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল, যেখানে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে 'লো কস্ট নো কস্ট' বিজ্ঞান মডেল তৈরি করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

রেখা দাঁ-কে বৃহত্তর গোবরডাঙা অঞ্চলের প্রথম মহিলা বিজ্ঞান লেখিকা বলে অভিহিত করলে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', 'জ্ঞান বিচিত্রা', 'কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান', 'বিজ্ঞানমেলা', 'এযুগের কিশোর বিজ্ঞানী', 'বিজ্ঞান অন্বেষক', 'এবং কি কে ও কেন', 'গণবিজ্ঞান চেতনা', দৈনিক 'কালান্তর'-এর 'প্রকৃতি ও মানুষ' পাতায়, 'গ্রামবাংলা পত্রিকা', 'কুশদহ বার্তা', 'গোবরডাঙা' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু লেখা প্রকাশ পেয়েছে। একসময় বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত মাসিক 'বিজ্ঞান সাময়িকী' এবং 'অণু' পত্রিকাতেও তিনি নিয়মিত লিখেছেন। রেখা দাঁ-র প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'উইপোকা', প্রকাশকাল ২০০০ সাল, প্রকাশক ছিল জ্ঞানবিচিত্রা। ছোটোবেলায় নিজেদের বাড়িতে উইপোকার ধ্বংসলীলা দেখে এই ক্ষুদ্রতর জীবটি সম্পর্কে রেখা দাঁয়ের কৌতুহল জন্মেছিল। তাঁদের বাড়ির কাঠের দেরাজে, বইয়ের আলমারিতে উইপোকার মাটির পাহাড় চাক্ষুষ করে তাঁর শিশুমনে গভীর প্রভাব পরেছিল। গ্রন্থটির নির্মাণ-ভাবনার জন্ম সেখান থেকেই বলা যায়। উইপোকার গোপন জীবনযাপন পদ্ধতি, স্বভাব বৈশিষ্ট্য, খাদ্য গ্রহণের প্রকৃতি, বংশবিস্তার, ধ্বংসলীলা ইত্যাদি সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদেই শিক্ষিকা হওয়ার পর অনেক পড়াশোনা করে, পত্রপত্রিকা-গ্রন্থাদি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যরাজি সংগ্রহ করে তিনি 'উইপোকা' গ্রন্থটি রচনা করেন। বিদগ্ধমহলে গ্রন্থটি উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। আজ সেটি মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তালিকায় নিজের জায়গা করেছে। রেখা দাঁয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বিজ্ঞান সাধনায় বাঙালি ও অন্যান্য'। গ্রন্থটি ২০১৭ সালে জ্ঞানবিচিত্রা প্রকাশনী থেকে প্রকাশ পায়। গ্রন্থটির প্রথম ভাগে রয়েছে চোদ্দজন বাঙালি বিজ্ঞানসাধকের জীবনকথা। আর গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে রেখা দাঁ-র নারী স্বাধীনতা, নারীশিক্ষা, নারীপ্রগতি বিষয়ক রচনাগুলি।

এহেন অনলস নেপথ্য-বিজ্ঞানকর্মী রেখা দাঁ ৫ জুলাই, ২০২৪ (শুক্রবার) দুপুর ২ টো ২৫ মিনিটে নিজগৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জ্ঞান বিচিত্রা ও বুক ওয়ার্ল্ড পরিবার (আগরতলা) রেখা দাঁ-র প্রয়াণে ৫ জুলাই, ২০২৪ প্রেস রিলিজ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। 'বিজ্ঞান অন্বেষক' পত্রিকা ও কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের পক্ষ থেকেও রেখা দাঁ-র প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। ৮ জুলাই, ২০২৪ তাদের ওয়েবসাইটে

‘বিজ্ঞান সংবাদ’ বিভাগে ‘না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন শিক্ষিকা রেখা দাঁ’ শিরোনামে সংবাদটি পরিবেশিত হয়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ আগস্ট, ২০২৪ সংখ্যায় রেখা দাঁ-র প্রয়াণে শোকসংবাদ প্রকাশ করে এই জনবিজ্ঞানকর্মীকে স্মরণ করেছে। ‘দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল’-এর মুখপত্র ‘বিজ্ঞান মেলা’ রেখা দাঁ স্মরণ সংখ্যা (৪৪ বর্ষ, জুলাই-আগস্ট ২০২৪) প্রকাশ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছে। রেখা দাঁ-র প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের মুক্তমঞ্চে ২৮ জুলাই, ২০২৪ (রবিবার) বিকেলে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই স্মরণসভায় বহু বিশিষ্টজন সমাজকর্মী, লেখক, বিজ্ঞানকর্মী, পরিবেশকর্মীরা উপস্থিত হয়েছিলেন। রেখা দাঁ-র ইচ্ছানুযায়ী তিনি প্রয়াত হলে তাঁর পরিবারের সম্মতিতে চক্ষুদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রেখা দাঁ ও তাঁর পরিবার সামাজিক কুসংস্কারে বিশ্বাসী না হওয়ায় তাঁর স্বামী দীপককুমার দাঁ এবং দুই কৃতি সন্তান মায়ের ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যু পরবর্তী কোনও আচারানুষ্ঠান, শ্রাদ্ধ ক্রিয়াদি পালন করেননি।

রেখা দাঁ একজন শিক্ষিকা ও বিজ্ঞানকর্মী হিসেবে সর্বদা চেয়েছিলেন যে, মেয়েরা যাতে বিজ্ঞান প্রসারের সঙ্গে যুক্ত হয়। বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য বিদ্যালয় পাঠক্রমের বাইরেও স্কুলের শিক্ষার্থীদের তিনি বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী করে তুলতে সদা জাগ্রত ছিলেন। ২০১৩ সালে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল রেখা দাঁ-কে ‘গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য’ বিজ্ঞান লেখক স্মারক সম্মানে ভূষিত করে। ২০১০ সালে দীপককুমার দাঁ ও তাঁর সহধর্মিনী রেখা দাঁ নিজেদের সঞ্চিত-উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে মুক্ত সারস্বত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে ‘গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ’ প্রতিষ্ঠা করেন। এক দশক অতিক্রান্ত এই প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে সমগ্র বাংলার গবেষক, পণ্ডিতবর্গ, পরিবেশ-বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে এর ত্রিতল ভবনে পরিবেশ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিজ্ঞানের বহুবিধ বিষয়ে বাংলা গ্রন্থাদি ও পত্র-পত্রিকার বিপুল সংগ্রহ গড়ে উঠেছে। গবেষকেরা তাদের গবেষণার কাজে এখানে নিয়মিত আসেন। প্রশান্তির বিষয় এই যে, তাঁদের স্বপ্নেগড়া প্রতিষ্ঠান গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের এহেন ব্যাপ্তি রেখা দাঁ চাক্ষুষ করে যেতে পেরেছেন। গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ-এর বিস্তার, ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়েই রেখা দাঁ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তবে তাঁর প্রয়াণে পরিবেশকর্মী, বিজ্ঞানকর্মীদের এক টুকরো মরুদ্যান হয়তো খোয়া গেল। সত্যিই, তিনিই তো ছিলেন ‘বিজ্ঞান আন্দোলনের মা’।

**লেখক : পরিবেশকর্মী ও সম্পাদক ‘জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা’**

*e-mail: ddey2917@gmail.com, M: 97340 67466*

---

**প্রবন্ধ : জগদীশচন্দ্র বসু**

**সম্রাজ্ঞী দাস**

জন্ম : ৩০.১১.১৮৫৮

# আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কর্মজীবন ও সাফল্য

মৃত্যু : ২৩.১১.১৯৩৭

*বিজ্ঞান দরবারে আয়োজিত পলাশি আচার্য দুর্গাপ্রসন্ন গার্লস হাইস্কুলে বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচি ২০২৪। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। জগদীশচন্দ্র বসুর কর্মজীবন ও সাফল্য শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। ছাত্রীর নাম সম্রাজ্ঞী দাস, অষ্টম শ্রেণি, স্কুলের নাম কাঁচরাপাড়া ইন্ডিয়ান গার্লস হাইস্কুল (উ.মা.)।*

*‘বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে*
*দূর সিন্ধুতীরে*
*হে বন্ধু গিয়েছ তুমি, জয়মাল্যখানি*
*সেথা হতে আনি*
*দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে*
*পরায়েছ ধীরে—’*

প্রিয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কথাগুলি যার উদ্দেশ্যে রচিত, তিনি হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। যিনি কেবল বাঙালি হিসেবেই নন, তিনি আন্তর্জাতিক স্তরের এক শ্রেষ্ঠ বাঙালি বিজ্ঞানী হিসেবেও পরিচিত।

বঙ্গজননীর রত্নগর্ভা হলেন তিনি। বঙ্গদেশে আবির্ভূত হয়েছেন বহু মনীষী। যে সকল প্রবাদপ্রতিম অমর মনীষী ও বৈজ্ঞানিক ভারতকে জাতীয় দরবারে আসন করে দিয়েছেন, যাঁদের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি মনে করে আজও আমার গর্বিত, তাঁদেরই মতো একজন হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি ‘গাছেদেরও প্রাণ আছে’ এটি প্রমাণ করে বিশ্বে এক আলোড়ন গড়ে তুলেছিলেন। তখন পরশ্রীকাতর পশ্চিম দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা তারস্বরে বলেন যে, একটি কোকিল ডাকিলে বসন্ত আসিয়াছে এমন মনে করাটা ঠিক নহে অর্থাৎ একজন বিজ্ঞানীর আবির্ভাব কখনোই প্রমাণ করে না ভারত বিশ্ব দরবারে বিজ্ঞান সাফল্য কতটা অর্জন করেছে, তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন স্বয়ং বিজ্ঞানী নিজেই। আর তারই সাথে সুর মিলিয়ে কবি গেয়ে ওঠেন।

*'একটি কোকিল অনেক দামি*
*হাজার কাকে কি—*
*একদামে কি বিকায় কভু,*
*তেল এবং ঘি।'*

**জন্ম ও বাল্যজীবন :** এই অমর প্রতিভাশীল বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছিল ঢাকার ময়মনসিংহ তথা রাঢ়িখালে ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর। তাঁর পিতা ছিলেন ভগবানচন্দ্র বসু। পেশায় একজন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মাতা ছিলেন শ্যামাসুন্দরী দেবী। তাঁর পিতা স্বভাবে ছিলেন স্বদেশানুরাগী ও স্বদেশি শিল্পের প্রতি উৎসাহী। জগদীশচন্দ্র বসু বাল্যকালে তাঁর মায়ের কাছ থেকে রামায়ণ ও মহাভারতের মতো কাহিনি শুনতেন। আর মহাকাব্যের নানান অলৌকিক ঘটনার কথা জানতে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠত।

তার শিক্ষাজীবন শুরু হয় ফরিদপুরের গ্রাম্য পাঠশালায়, যেখানে লেখাপড়া শেষ করে এগারো বছর বয়সে তিনি ভর্তি হলেন কলকাতার হেয়ার স্কুল ও তারপরে ভর্তি হলেন কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি ভর্তি হলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। সেখানে তিনি ফাদার লাঁফোরের সান্নিধ্যে আসেন, তিনি ছিলেন কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। ১৮৮০ সালে উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা সম্পর্কে পাঠের জন্য তিনি গেলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি সেখান থেকে পাশ করলেন বি.এ. আর অসুস্থতার জন্য তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস.সি. ডিগ্রি লাভ করে ফিরে এলেন বাংলায়।

**কর্মজীবন :** আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর বিভিন্ন কর্মের দ্বারা মানুষের মধ্যে দিগন্তের নব উদ্‌ঘাটন করেছেন, যা তরুণ সমাজকে আগ্রহী করে তুলেছে বিভিন্ন বিজ্ঞানরহস্য উন্মোচন করতে। তাঁর কর্মজীবনের কিছু অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ—

**আবিষ্কার :** আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কারকে মূলত দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

**পদার্থবিদ্যায় আবিষ্কার ও উদ্ভিদবিদ্যায় আবিষ্কার :** এছাড়াও তিন ধাপে এই আবিষ্কার সম্পন্ন হয়েছে, প্রথমত বিদ্যুৎ, দ্বিতীয়ত শব্দতরঙ্গ, তৃতীয়ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর পেশীগত উত্তেজনাজনিত বিদ্যা।

**পদার্থবিদ্যায় আবিষ্কার :** তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। তিনি ক্রমেই হয়ে উঠেছিলেন বিজ্ঞান সাধনায় ব্রতী। ছেলেবেলা থেকে অজানাকে জানার উদ্বেগ তাঁর মনে আরও তীব্র আকার ধারণ করে। বিদ্যুৎ তরঙ্গের আবিষ্কার সারাবিশ্বে এক আলোড়ন গড়ে তুলেছিল। তার জন্য তাঁকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরস্কৃত করা হয় ডি.এস.সি. উপাধিতে। বিনা তারে শব্দগ্রহণ ও শব্দপ্রেরণ এই বিষয়টি যা আমাদের কাছে বর্তমান রেডিও রূপে, যার আবিষ্কর্তা হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। কিন্তু ঠিক এই একই সময়ে ইতালির বিজ্ঞানী মার্কনিও এই রেডিও আবিষ্কার করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ জগদীশচন্দ্র বসু তার প্রাপ্ত সম্মান পেলেন না, সেটি পেলেন ইতালির বিজ্ঞানী মার্কনি। সেইজন্য শেষে জগদীশচন্দ্র বসু বলেছিলেন যে, যাঁহারা আমার বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন তাঁহারাই আমার আবিষ্কার নিজের নামে বলিয়া প্রকাশ করেন।

**উদ্ভিদবিদ্যায় আবিষ্কার :** তিনি জড় ও চেতনার প্রাণের সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন। যা সারাবিশ্ব জুড়ে শ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত হয়েছিল। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, জড় ও উদ্ভিদের চেতনার বিষয়ে যে তথ্য, যে উপলব্ধি করে গিয়েছিলেন প্রাচীন দার্শনিকরা তা একাধারে সত্য নয়। তিনি বলেছেন যে, জড় ও উদ্ভিদের মধ্যে বিস্তর প্রার্থক্য আছে। প্রাণীদের মতো উদ্ভিদরাও সংবেদনশীল পাশাপাশি তাদেরও দুঃখ বেদনা বর্তমান। তিনি নিজে ক্রেসক্রোগ্রাফ যন্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে, উদ্ভিদরাও প্রাণে আবদ্ধ। তাদের প্রাণস্পন্দন ও প্রাণসংগীত তিনি প্রমাণ করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন লজ্জাবতী গাছের কথা। যাকে স্পর্শ করা মাত্রই তা গুটিয়ে এক জায়গায় হয়ে থাকে। উদ্ভিদের সংবেদনশীলতার প্রমাণ তিনি এভাবেই করেন।

**অধ্যাপনা জীবন :** তিনি ছিলেন অন্যায়ের প্রতিবাদী। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হওয়ার পর সেখানে দেখলেন যে, ভারতীয় ও শেতাঙ্গদের মধ্যে বেতন বৈসম্য বর্তমান। তারই নীরব প্রতিবাদ করতে তিনি টানা তিন বছর পর্যন্ত বিনা বেতনে সেখানে অধ্যাপনা করেন, শেষে কর্তৃপক্ষ হার মানতে বাধ্য হয়েছিল। এককালীন তাঁকে তিন বছরের বেতন দেওয়া হলে তিনি তা দিয়ে পিতৃঋণ শোধ করেন।

**সাহিত্য প্রীতি :** তিনি একাধারে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন বটে কিন্তু তিনি ছিলেন দার্শনিক ও সাহিত্যিক। তাঁর লেখা 'অব্যক্ত' নামক গ্রন্থে তিনি তার জীবনের বেদনার কথা প্রস্ফুটিত করেন, যার দ্বারা প্রকাশিত হয় তাঁর দার্শনিক প্রীতি, বিজ্ঞান মনীষা ও সাহিত্য প্রতিভা। তিনি মূলতঃ গবেষণামূলক কথা লিখেছেন অধিকাংশ ইংরেজি বইতে যার মধ্যে অন্যতম হল— 'Resources in Living and Non-living' এবং আর একটি বই হল— 'Collected Physical Papers', যা এখনও তার পৈত্রিক ভিটেতে সংরক্ষিত হয়ে আছে।

ঘ) **বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা :** তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে পরাধীন ভারতে বিজ্ঞানের দৈণ্যতার গ্লানি দূর করতে ১৯১৭ সালের ৩০ নভেম্বর প্রতিষ্ঠা করেন বসুবিজ্ঞান মন্দির। যেখানে বহু তথ্য সংরক্ষিত আছে যাতে তরুণ প্রজন্ম এর দ্বারা বিভিন্ন রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেন আর বিজ্ঞানকে উৎকর্ষের শীর্ষে আরও নিয়ে যেতে পারেন।

আবার বর্তমানে তাঁর পৈত্রিক ভিটায় গড়ে তোলা হয়েছে জগদীশচন্দ্র বসু কলেজ ও ইনস্টিটিউশন। এছাড়াও তারই মাঝে রয়েছে জগদীশচন্দ্রের পুরোনো একচালা বাড়ি, যেখানে বহু তথ্য, চিঠি সংরক্ষিত আছে।

**মহাপ্রয়াণ :** কালজয়ী বিশ্ববন্দিত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু পরলোক গমন করেন ১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর তারিখে। তবে এই অমর বিজ্ঞানী আমাদের সকলের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন সারাজীবন।

**উপসংহার :** মাতৃভাষা ও বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রথম অঙ্কুর পুঁতেছিলেন বিজ্ঞানী নিজেই। তাঁর আমূল কিছু আবিষ্কার বিজ্ঞানজগৎকে উচ্চস্তরে পৌঁছে দিয়েছে। তিনি বিভিন্ন সংস্থা যেমন, রয়াল সোসাইটির সদস্য ছিলেন। এছাড়াও ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯২৬-১৯৩০ পর্যন্ত তিনি লিগ অব নেশনসের ইন্টেলেকচুয়াল কমিটির সভাপতি ছিলেন।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর প্রতিটি আবিষ্কারের প্রতি অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর প্রতিটি আবিষ্কারই হল বিশ্বজয়ের প্রতীক। তার জীবনী আজও স্বর্ণাক্ষরে খোদিত আছে ইতিহাসের পাতায়। তাঁকে তার কৃতিত্বের জন্য 'ফেলো অফ দা রয়াল সোসাইটি' এই পদকে ভূষিত করা হয়। তিনি পরাধীন ভারতমাতার মাথায় তাঁর কৃতিত্বের দ্বারা যে মুকুট তুলে দিয়েছেন, তার জন্য আমরা সারাজীবন গর্বিত থাকব।

"The true laboratory is the mind where behind illusious we uncover the laws of truth" –J. C. Bose

A Speech by Sir Jagadish Chandra Bose

# ছাত্র-ছাত্রীদের পাতা : ছবি অঙ্কন

(বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার কর্মসূচী—২০২৪)

**১. জল দূষণ : তৃষা বাড়ৈ (viii)**
কাঁচরাপাড়া ইন্ডিয়ান গার্লস হাইস্কুল

**২. প্লাস্টিক দূষণ : সুস্মিতা সরকার (viii)**
চাঁদমারী নগেন্দ্রবালা বালিকা বিদ্যালয়

**৩. পৃথিবী বাঁচাও : জিনিয়া কর্মকার (X)**
পলাশি এ.ডি.পি. গার্লস হাইস্কুল

**৪. বসুন্ধরার বিপদ : নওসিন খাতুন (X)**
পলাশি এ.ডি.পি. গার্লস হাইস্কুল

**৫. গাছ বাঁচাও : উত্তরা দাস (VIII)**
জোনপুর গার্লস হাইস্কুল

BIGYAN ANNESWAK VOL : 22 Issue No. 1 January-February 2025 RNI : WBBEN/2003/11192 Rs. 20/-
ISSN 2582-5674

ড. রাজা রাউত

# যারা হারিয়ে যাচ্ছে

**স্তন্যপায়ী** : **এশীয় জলা বুনো মোষ**
**সাধারণ ইংরাজি নাম** : *Asian Wild Water Buffalo*
**বিজ্ঞানসম্মত নাম** : *Bubalus amee*

এই স্তন্যপায়ীটি মূলত গাভী গোত্রের অধীনে পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ প্রাণীটি ভারতীয় উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গুটি কয়েকটি এলাকায় বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায়। একটি হিসেব অনুযায়ী সারা বিশ্বে এদের সংখ্যা আড়াই থেকে সাড়ে তিন হাজারের মধ্যে হবে যার ৯৫% ভারতেই আছে। এদের জনসংখ্যা গত তিন দশকে ৫০ শতাংশ কমে আসছে।

**সরীসৃপ** : **গঙ্গা কাছিম**
**সাধারণ ইংরাজি নাম** : *Indian Softshelled Turtle*
**বিজ্ঞানসম্মত নাম** : *Nilssonia gangetica*

এই দুর্লভ কাছিম সিন্ধু, গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, নর্মদা, মহানদী প্রভৃতি নদী তীরবর্তী অঞ্চলে সাধারণত পাওয়া যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের ভারত ছাড়া বিভিন্ন দেশ যেমন আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপালে পাওয়া যায়। আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে এরা আজ দুর্লভ হয়ে পড়ছে।

**পক্ষী** : **সবুজ মুনিয়া**
**সাধারণ ইংরাজি নাম** : *Green Avadavat*
*Green Munia*
**বিজ্ঞানসম্মত নাম** : *Amandava formosa*

এই দুর্লভ পাখিটি মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে সীমাবদ্ধ। পশ্চিম ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন এলাকায় অল্পবিস্তর এদের দেখা যায়। একসময় আমেদাবাদকে কেন্দ্র করে এই পাখি সহ অন্যান্য পাখির অবৈধ পাচারের ব্যবসা ছিল যার জেরে এদের জনসংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে। বর্তমানে অবশ্য নিষিদ্ধ। ভারতের মূলত রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অল্পবিস্তর কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গেও দেখা যায়। বর্তমানে প্রাণীটির পাচার বন্ধ হলেও আবাসস্থল ধ্বংসের জন্য এরা বিপন্ন।

**অমেরুদণ্ডী** : **বার্নিশ অ্যাপোলো প্রজাপতি**
**সাধারণ ইংরাজি নাম** : Varnished Apollo
**বিজ্ঞানসম্মত নাম** : *Parnassius acco*

প্রজাপতির এই প্রজাতি আজ খুব দুর্লভ। মূলত উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়। ভারতের কাশ্মীর, হিমাচল ও সিকিমে দেখা যায়। ভারতের বাইরে পাকিস্তান, নেপাল ও চিনে পাওয়া যায় এটি। আজ এই প্রজাতি সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য আমাদের কাছে নেই।

লেখক বিজ্ঞানের শিক্ষক, পরিবেশকর্মী ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক
email : rajarouthbhbl@gmail.com M. 9474417178